সূচিপত্র

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৯ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-২০২৬

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জুলাই ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৭.২৬	০৩:৪৮	১২:০৩	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭
০২.০৭.২৬	০৩:৪৯	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫০	০৮:১৭
০৩.০৭.২৬	০৩:৪৯	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫০	০৮:১৭
০৪.০৭.২৬	০৩:৫০	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫০	০৮:১৭
০৫.০৭.২৬	০৩:৫০	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫০	০৮:১৭
০৬.০৭.২৬	০৩:৫১	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৭
০৭.০৭.২৬	০৩:৫১	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
০৮.০৭.২৬	০৩:৫২	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
০৯.০৭.২৬	০৩:৫২	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১০.০৭.২৬	০৩:৫৩	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৪৯	০৮:১৬
১১.০৭.২৬	০৩:৫৩	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৪৯	০৮:১৫
১২.০৭.২৬	০৩:৫৪	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৩.০৭.২৬	০৩:৫৫	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৪.০৭.২৬	০৩:৫৫	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৫.০৭.২৬	০৩:৫৬	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৪৮	০৮:১৪
১৬.০৭.২৬	০৩:৫৬	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৪
১৭.০৭.২৬	০৩:৫৭	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
১৮.০৭.২৬	০৩:৫৮	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
১৯.০৭.২৬	০৩:৫৮	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১২
২০.০৭.২৬	০৩:৫৯	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১২
২১.০৭.২৬	০৩:৫৯	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২২.০৭.২৬	০৪:০০	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৬	০৮:১১
২৩.০৭.২৬	০৪:০১	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৬	০৮:১০
২৪.০৭.২৬	০৪:০১	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৯
২৫.০৭.২৬	০৪:০২	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৯
২৬.০৭.২৬	০৪:০৩	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৮
২৭.০৭.২৬	০৪:০৩	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৭
২৮.০৭.২৬	০৪:০৪	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৪	০৮:০৭
২৯.০৭.২৬	০৪:০৫	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৬
৩০.০৭.২৬	০৪:০৫	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫
৩১.০৭.২৬	০৪:০৬	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৫

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

জুলাই ২০২৬ ঈসায়ী

মুহাররম-সফর ১৪৪৮ হিজরী

আষাঢ়-শ্রবন ১৪৩৩ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম

প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন

শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান

মো: জামাল হোসেন

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১

ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬

মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ

বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
তর্জুমানুল হাদীস
রেজি নং ডি.এ.১৪২
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠
الهاتف : ٢٢٤٤٥٨٥٥١-٨٨٠٢+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،
المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،
رئيس التحرير: محمد هارون حسين.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
❖ সরকারের নতুন বাজেট : বাস্তবায়ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ।...৩

দারসুল কুরআন
❖ তাক্বওয়াই মুমিনের উভয় জগতের উত্তম পাথেয়।.....৫
শাইখ মো : সাইফুল ইসলাম

দারসুল হাদীস
❖ হাদীসের আলোকে মুসলিমদের ঐক্য, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা.....৮
শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী

প্রবন্ধ :
❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র.....১১
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
❖ সালাফ চরিত।.....১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ ইসলামিয় দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত।.....১৫
ড. রেজাউল করিম মাদানী
❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।.....১৮
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ নির্মল হৃদয়।.....২১
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
❖ তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা।.....২৪
আব্দুর রউফ
❖ ফাসিকের পরিচয়, হুকুম, বৈশিষ্ট্য ও তার পরিণতি।.....২৭
আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ
❖ যিকির নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা।.....৩১
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
❖ ফুটবল বিশ্বকাপ আগ্রাসী শক্তির আবির্ভাব।.....৩৩
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।.....৪০

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সম্পাদকীয়

الافتتاحية

সরকারের নতুন বাজেট : বাস্তবায়ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট কেবল আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়; এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক দর্শন, উন্নয়ন কৌশল এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন। চলতি অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে ঘিরে যেমন আশাবাদ তৈরি হয়েছে, তেমনি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের সংশয়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, দুর্বল রাজস্ব কাঠামো, ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে এই বাজেট কতটা বাস্তবায়নযোগ্য-সেই প্রশ্ন এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছে। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৫ শতাংশে।

অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, 'সরকারের অগ্রাধিকার হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।' (Reuters +1)

এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবসম্মত হলেও সেগুলো অর্জনের পথ মোটেও সহজ নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি। খাদ্যপণ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাপক চাপে রয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, একদিকে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে, অন্যদিকে সম্প্রসারণমূলক বাজেট ব্যয় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তুলতে পারে। দ্য ডেইলি স্টারের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, 'উচ্চ সরকারি ব্যয় এমন সময়ে চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে, যখন মূল্যস্ফীতি এখনও স্থিতিশীল নয়।' (The Daily Star)

অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি কমানোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু লক্ষ্য নির্ধারণ যথেষ্ট নয়; বাজার তদারকি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি।

বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD)-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, 'বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত প্রায় ৭.৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা এশিয়ার অন্যতম নিম্ন হার।' (Centre for Policy Dialogue (CPD))

এ অবস্থায় বাজেটে নির্ধারিত উচ্চ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হতে পারে।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (MCCI) মন্তব্য করেছে যে, '৬.৯৫ ট্রিলিয়ন টাকার রাজস্ব লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং তা অর্জনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।' (The Financial Express)

রাজস্ব সংগ্রহে ডিজিটালাইজেশন, করজাল সম্প্রসারণ এবং কর ফাঁকি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি। কিন্তু খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, সুশাসনের অভাব এবং উচ্চ সুদের কারণে বিনিয়োগের পরিবেশ এখনও দুর্বল।

অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, 'এটি মোটামুটি বাস্তবধর্মী বাজেট হলেও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন হবে। রাজস্ব আহরণ, অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে।' (The Daily Star)

তাঁর মতে, সংস্কারের সুফল পেতে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকার দেশীয় ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে চায়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে,

'বাংলাদেশ নতুন ঋণ কর্মসূচির জন্য আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা করছে, যেখানে রাজস্ব সংস্কার ও আর্থিক খাতের সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।' (Reuters)

IMF-এর মতে, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা দূর করতে পারলে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে শক্তিশালী হতে পারে।(Reuters)

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান দুটি উৎস হলো তৈরি পোশাক রফতানি এবং প্রবাসী আয়। সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ স্থিতিশীল থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে।

অন্যদিকে, তৈরি পোশাক শিল্প এখনও দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি অবদান রাখছে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ শিল্প উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। (Reuters)

তবে বৈশ্বিক বাজারে মন্দা দেখা দিলে এ খাতও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ অপরিহার্য।

বাজেটে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না; প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে সেবার মান নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। (The Financial Express)

বাংলাদেশের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট উচ্চাভিলাষী এবং সংস্কারমুখী একটি আর্থিক পরিকল্পনা। এতে অর্থনীতিকে গতিশীল করার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি বাস্তবায়ন ব্যর্থ হলে রাজস্ব ঘাটতি, মূল্যস্ফীতি ও ঋণনির্ভরতার ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

অতএব, এই বাজেটের সফলতা নির্ভর করবে চারটি বিষয়ের ওপর-সুশাসন, রাজস্ব সংস্কার, ব্যাংকিং খাতের পুনর্গঠন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা। লক্ষ্য নির্ধারণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাস্তবায়নের সক্ষমতা। কারণ উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড কাগজে-কলমে ঘোষিত বরাদ্দ নয়; বরং সেই বরাদ্দ কতটা জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে, সেটিই শেষ পর্যন্ত মূল্যায়িত হবে।❑❑

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

তাক্বওয়াই মু'মিনের উভয় জগতের উত্তম পাথেয়

শাইখ মো: সাইফুল ইসলাম মাদানী❖

তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জন্য উত্তম ওয়াসিয়াত, এটা ইবাদতের সারাংশ। মু'মিনের জীবনে তাক্বওয়ার গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু মানব শরীরের মাথার গুরুত্ব রয়েছে। তাক্বওয়া বান্দা ও আল্লাহর মাঝে ভালোবাসার সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান ভয় পায় এবং তার মনে ওয়াসওয়াসা তৈরি করতে পারে না।

তাক্বওয়াই একমাত্র গুণ যা মুমিনকে উভয় জগতের সফলতা এনে দিতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

'নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো।'[১]

আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট : ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা হজ্জে আসতো কিন্তু পাথেয় বা রাস্তা খরচ নিয়ে আসতো না, তারা বলতো আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি অথচ তারা যখন মক্কায় আসতো তখন মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াতো। তাদের এহেন অবাঞ্ছিত কাজকে উক্ত আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে নিষেধ করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ্জ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।[২]

❖ সচিব, বাংলাদেশ আহলে হাদীস শিক্ষা বোর্ড।

[১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৯৭।

[২] তাফসির মায়ারিফুল কুরআন-পৃ. ১০৩

পক্ষান্তরে মক্কায় এসে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে অপরকেও জ্বালাতন করে থাকে, তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, হজ্জের সফরে বের হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় পাথেয় নেয়া আবশ্যক, এটাই তাক্বওয়ার দাবি। কিন্তু এটা তায়াক্কুলের পরিপন্থি না।

আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করে নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। এটাই রাসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তাওয়াক্কুলের প্রকৃত ব্যাখ্যা।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

تَزَوَّدُوا তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর, মু'মিনগণ তাদের সৎ আমল দ্বারা পাথেয় গ্রহণ করে থাকে। إِنَّ শব্দটি এখানে জোর প্রদান অব্যয় হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। خَيْرَ এখানে اسم تفضل হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ, অধিক কল্যাণকর। الزَّاد শব্দটি দ্বারা খাদ্যসামগ্রী বা অন্যান্য পথ খরচকে বুঝানো হয়েছে, আর মু'মিননের পাথেয় হচ্ছে তার সৎ আমল।

التَّقْوَى শব্দ দ্বারা ঐ বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আল্লাহর আদেশ নিজের জীবনে প্রয়োগ করে বা তা অনুসরণ করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে। এক কথায় সর্বকাজে আল্লাহকে ভয় করা।

আয়াতের শিক্ষা :

১. প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

২. মানুষের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া।

৩. আখিরাতের জন্য সৎ আমলকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. তাক্বওয়াই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও পাথেয়।

৫. দুনিয়াবী আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কালের পরিপন্থি নয়।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশে প্রথমে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কারো ওপর বোঝা হয়ে যাওয়া বা মানুষের কাছে হাত পাতার পরিবর্তে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা উচিত।

এরপর আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার সফরের জন্য খাদ্য ও সামগ্রী যেমন প্রয়োজন, তেমনি আখিরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো তাক্বওয়া, অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ মানা, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

দারসুল কুরআনের এই পর্বে আয়াতে উল্লেখিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাক্বওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকবে, তাক্বওয়ার শাব্দিক অর্থ, ভয় করা, বেঁচে থাকা।

তাক্বওয়ার পারিভাষিক অর্থ : তাক্বওয়ার প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো যা তালক বিন হাবিব উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর আনুগত্য করা আল্লাহর সওয়াবের আশা করা; এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর অবাধ্যতা ত্যাগ করা, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা।[৩]

তুমি আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ও হিদায়াতের আলোকে, এখানে نور (নূর) বলতে মূলত ইলম (জ্ঞান) হিদায়াত (সঠিক পথ নির্দেশ) এবং প্রমাণভিত্তিক সচেতনতা বোঝানো হয়েছে।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কাবকে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, আপনি কি কখনও কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন, তখন আপনি কী করেছিলেন? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কাপড় গুটিয়ে সতর্কতার সঙ্গে চলেছিলাম এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম। তখন উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটাই তাক্বওয়া।[৪]

অর্থাৎ, কাঁটাযুক্ত পথে চলার সময় যেমন মানুষ খুব সতর্ক থাকে, তেমনি একজন মু'মিন গুনাহ ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকে এটার নামই তাক্বওয়া।

কবি ইবনুল মুতাজ বলেন : ছোট-বড় সব গুনাহ পরিত্যাগ করো, এটাই তাক্বওয়া।

কাঁটাযুক্ত জমিনে চলা মানুষের মতো চল, যে সামনে যা দেখে সতর্ক থাকে।

[৩] আযযুহুদ ইবনে মুবারক-পৃ. ১৩৪৩।
[৪] তাফসীর কুরতুবী ১/২০৩ পৃ.।

কোনো ছোট গুনাহকে তচ্ছ মনে করো না; কারণ বিশাল পাহাড় ছোট ছোট পাথরকণা দিয়েই গঠিত।[৫]

১। কুরআনে 'তাক্বওয়া' শব্দটি বিভিন্ন অর্থ ও বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ অর্থ, একমাত্র আমাকেই ভয় কর।[৬]

এখানে আবার ভয়ের ২টি ধরন রয়েছে।

ভয়, আল্লাহর মহত্ব ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূদ ভীতি ও শ্রদ্ধা যাকে আরবীতে الخشية বলে। মর্যাদা ও মহিমার কারণে গভীর শ্রদ্ধা, গাম্ভীর্য এবং ভীতি মিশ্রিত সম্মানের কারণে যে ভীতি মগজে তৈরি হয় তাকে الهيبة বলে।

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভয় কেবলি আল্লাহকেই করতে হবে, অন্য কাউকে না। তবে হিংস্র জীবজন্তুর ভয়, শত্রুর ভয় এগুলো হলো স্বাভাবিক ভয় যা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় তৈরি করে না। কারণ এটা প্রকৃতিগত ভয় যা সকল মানুষের অন্তরেই বিদ্যমান।

হাফেজ ইবনু রজব বলেন : কখনো 'তাক্বওয়া' শব্দটি আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যিনি (হাশরে) তোমাদেরকে একত্রিত করবেন।

তাক্বওয়ার সম্পৃক্তি যখন আল্লাহর দিকে করা হয় তখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়, তোমরা আল্লাহর থেকে বেচে থাকো এবং তিনি এমন সত্তা, যার অবাধ্যতা থেকে সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকা উচিত। তার রাগের কারণে বান্দার ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে।[৭]

আল্লাহ বলেন : وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (শাস্তি, অসন্তুষ্টি ও প্রতিশোধ) সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।[৮]

২. কুরআনে তাক্বওয়াকে ইবাদত এবং আনুগত্য অর্থে ও ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾

[৫] দিওয়ান-১/৪৫।
[৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৪১।
[৭] জামিউল উলুম ওয়ালহিকাম পৃ. ১৫৮-১৫৯।
[৮] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৯৬।

অর্থ, ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য করো এবং তাঁর যথাযথ ইবাদত করো।’[৯]

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা হবে তার নাফরমানী করা যাবে না, তাকে স্মরণ করা হবে তাকে ভোলা যাবে না, তার নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে, অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না।[১০]

৩ পাপ থেকে পবিত্র থাকা অর্থে কুরআনে তাক্বওয়ার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে : আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

অর্থ, ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারাই সফলকাম।’[১১]

তাক্বওয়ার হুকুম : শারঈয়াতের অসংখ্য আবশ্যকীয় বিধান রয়েছে। তার মধ্যে আল্লাহভীতি অর্জনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সেটার প্রমাণ কুরআন সহীহ সুন্নাহ ও এই উম্মতের সালফে সালেহীনদের কথা দ্বারা প্রমাণীত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাক্বওয়া অবলম্বনের আদেশ ও অসিয়ত করেছেন।

তাক্বওয়া হলো এমন এক জীবন পরিবর্তনকারী গুণ, যা লালন করলে, পালন করলে ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ ঘটালে তখন ব্যক্তিগত জীবন আল্লাহভীরুতার চাদরে আবৃত থাকে। পারিবারিক জীবনে আল্লাহর রহমতের সুবাতাস বইতে থাকে এবং সামাজিক জীবনে আল্লাহ ভীরুতার প্রয়োগের ফলে অসংখ্য পাপ অপরাধ মারামারি হানাহানি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।[১২]

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : তাক্বওয়া অবলম্বনের আদেশ সমস্ত জাতিকে দেয়া হয়েছে।[১৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : সমস্ত সৃষ্টি জীবের ওপর তাক্বওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বহুস্থানে এর নির্দেশ দিয়েছেন এর প্রতি উপদেশ দিয়েছেন।

যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তাদের নিন্দা করেছেন। আর যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর তাক্বওয়ার মুখাপেক্ষী মনে করে না অর্থাৎ তাক্বওয়াকে উপেক্ষা করে, আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।[১৪]

কিছু আলেম বলেছেন : এই আয়াতটি সমগ্র কুরআনের আয়াতসমূহের কেন্দ্রবিন্দু; কারণ কুরআনের সমস্ত বিষয়বস্তু এর চারপাশেই আবর্তিত হয়।[১৫]

এই আয়াতের তাফসীরে শাইখ আস-সাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান ও ব্যাপক রাজত্বের সর্বজনীনতার কথা বর্ণনা করেছেন, যা সমস্ত প্রকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। তিনি তাকদীরগত এবং শারঈ উভয় প্রকার ব্যবস্থাপনায় ইচ্ছামতো পরিচালনা করেন।

তার শারঈ পরিচালানার একটি দিক হলো তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত জাতিকে তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তাক্বওয়ার মধ্যে আদেশ নিষেধ পালন, বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন এবং যারা এই উপদেশ অনুযায়ী চলবে তাদেরকে সাওয়াব প্রদান ও যারা এটিকে অবহেলা করবে এবং নষ্ট করবে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন :

اتق الله حيث ما كنت.

‘তুমি যেখানেই যাও না কেন আল্লাহকে ভয় কর।’

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই তাক্বওয়া অবলম্বন করা যে অপরিহার্য এবং এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-এই বিষয়ে একমত হয়েছে।[১৭] ❑❑

---

[৯] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০২।
[১০] তাফসীর তাবারী পৃ. ৩/৩৭৫।
[১১] সূরা আন-নূর আয়াত : ৫২।
[১২] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৩১।
[১৩] তাফসীর কুরতুবী ৫/৩৮৯।
[১৪] সারহুল উমদাহ ৩/৬২৭ পৃ.।
[১৫] তাফসীরুল কুরতুবী ৫/৩৮৯।
[১৬] তাফসীর আস-সাদী পৃ. ২০৭।
[১৭] তিমরমিযী হা : ১৯৮৭ হাদীসটি হাসান।

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

হাদীসের আলোকে মুসলিমদের ঐক্য, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর।

অতঃপর-

ইসলাম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, দয়া-মমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার যে অনন্য শিক্ষা দিয়েছে, তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মুসলিম উম্মাহকে একটি অবিচ্ছেদ্য দেহের সঙ্গে তুলনা করা। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং কল্যাণ-অকল্যাণের অংশীদার হবে।

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

বর্ণনাকারী নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোনো অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[১৮]

এই মহান হাদীস মুসলিম সমাজের প্রকৃত রূপ এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

হাদীসের শব্দগত ব্যাখ্যা :

১. "তাওয়াদ্দুহুম" (توادهم) - পারস্পরিক ভালোবাসা :

অর্থাৎ, মুমিনগণ একে অপরকে ভালোবাসবে, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে, ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।"[১৯]

এটি ঈমানের পূর্ণতার অন্যতম লক্ষণ।

২. "তারাহুমুহুম" (تراحمهم) - পারস্পরিক দয়া ও মমতা :

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সে অন্য মুমিনের প্রতি দয়াশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর সঙ্গীরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়ালু।"[২০]

তাই একজন মুমিন অসুস্থকে দেখতে যায়, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, অসহায়কে সহযোগিতা করে এবং বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ায়।

৩. "তা'আতুফিহিম" (تعاطفهم)- পারস্পরিক সহমর্মিতা :

অর্থাৎ, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের সুখে আনন্দিত হবে এবং তার দুঃখে ব্যথিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর।"[২১]

❖ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

[১৮] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

[১৯] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

[২০] সূরা আল-ফাতহ আয়াত : ২৯।

৪. "একটি দেহের ন্যায়"

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম সমাজকে একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ দেহের প্রত্যেক অঙ্গ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি অঙ্গের ব্যথা গোটা শরীরকে অস্থির করে তোলে।

এটি নবী ﷺ-এর অন্যতম গভীর ও হৃদয়স্পর্শী উপমা।

হাদীস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা :

১. ঈমানী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য :

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেন :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[২২]

সুতরাং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কেবল একটি স্লোগান নয়; বরং এটি বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের বাস্তব প্রকাশ।

এর দাবিসমূহ হলো-

* আল্লাহর জন্য ভালোবাসা
* আন্তরিক উপদেশ প্রদান
* সহযোগিতা করা
* সদাচরণ করা
* মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।"[২৩]

২. মুসলমানদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন :

মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন আল্লাহর দয়া লাভের অন্যতম মাধ্যম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"দয়াশীলদের প্রতি পরম দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানের অধিবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

দয়ার বাস্তব রূপগুলো হলো-

* রোগীকে দেখতে যাওয়া
* দরিদ্রকে সাহায্য করা
* এতিমের লালন-পালন করা
* বিপদগ্রস্ত মানুষের কষ্ট দূর করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন।"[২৪]

৩. মুসলমানের সুখ-দুঃখে শরিক হওয়া :

একজন প্রকৃত মুমিন আত্মকেন্দ্রিক নয়। সে নিজের পাশাপাশি তার ভাইয়ের কথাও চিন্তা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য একটি ভবনের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় করে।"[২৫]

এরপর তিনি নিজের আঙুলগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

সালাফে সালেহীনের জীবনে এর বাস্তব নমুনা

মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব

মক্কা থেকে হিজরত করে আগত মুহাজির সাহাবীদের সঙ্গে মদিনার আনসার সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

আনসারগণ আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

"তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।"[২৬]

---

[২১] সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত : ২।
[২২] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১০।
[২৩] সহীহ মুসলিম।
[২৪] সহীহ মুসলিম।
[২৫] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
[২৬] সূরা আন-নিসা আয়াত : ২৭।

আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দরিদ্র, এতিম ও অসহায়দের সহযোগিতা করতেন, বিধবা ও মিসকীনদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাতে বের হয়ে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, নিজের কাঁধে খাদ্য বহন করে অভাবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং সর্বদা আশঙ্কা করতেন যে, আল্লাহ তাঁর নিকট জনগণের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ফলাফল

১. উম্মাহর শক্তি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।"[২৭]

২. সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়

যেখানে ভালোবাসা ও দয়া থাকে, সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা কমে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না; বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।"

৩. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[২৮]

বর্তমান মুসলিম সমাজে এই চেতনা দুর্বল হওয়ার কারণ :

* ঈমানের দুর্বলতা
* দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি
* হিংসা ও বিদ্বেষ
* আত্মকেন্দ্রিকতা
* সম্পর্কচ্ছেদ ও পারস্পরিক দূরত্ব
* মুসলিম উম্মাহর সমস্যার প্রতি উদাসীনতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন : "তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না এবং সম্পর্ক নষ্ট করো না।"

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার উপায়

১. ঈমানকে শক্তিশালী করা।

২. সালামের প্রসার ঘটানো।

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।"

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ রাখা।

৪. সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করা।

৫. মুসলমানদের জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন।"[২৯]

উপসংহার

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

এই মহান হাদীস আমাদেরকে এমন একটি সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়, যার ভিত্তি হবে ভালোবাসা, দয়া, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। একজন মুমিন কেবল নিজের জন্য বেঁচে থাকে না; বরং সে তার দ্বীন, উম্মাহ ও মুসলিম ভাইদের কল্যাণের জন্যও বেঁচে থাকে। সে অন্যের আনন্দে আনন্দিত হয়, অন্যের কষ্টে ব্যথিত হয়, অভাবির পাশে দাঁড়ায় এবং বিপদগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরসমূহে পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টি করেন এবং আমাদেরকে সত্যিকার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।❑❑

[২৭] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৩।
[২৮] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৯৫।
[২৯] সূরা আল-হাশর আয়াত : ১০।

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন: অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

হজ্জ একটি অসাধারণ ইবাদত। অবশ্য এটি ইসলাম প্রণীত পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। সালাত সিয়াম প্রতিপালনে আর্থিক সামর্থ্য জরুরি নয়। সুস্থতার মতো একটি উপাদানই বিবেচ্য। অবশ্য অসুস্থতা জনিত কারণ ওই দু'টো ইবাদত আবার ভিন্নরূপে আদায়ের সুযোগ আছে, কিন্তু হজ্জের তেমনটি নয়। এ ক্ষেত্রে আর্থিক শারীরিক সক্ষমতা জরুরি।

আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম প্রতিটি মুসলিমদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন ফরজ। এটি এমন একটি মহান ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ-আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটায়। হজ্জ কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি নয়; বরং এটি ঈমান, তাক্বওয়া, ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মশুদ্ধির এক অনন্য প্রশিক্ষণ।

হজ্জের ফযিলত একজন সামর্থ্যবান মুসলিমকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। ইহজগতিক মায়া-মমতা ত্যাগ করে স্রষ্ঠার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাকে তাড়িত করে। কেননা নবী (সা)-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে জানা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করল এবং অশ্লীল ও পাপচার থেকে বিরত থাকল, সে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে।[৩০] শুধু ত্যাগ নয়, সমর্পিত হওয়া ও ত্যাগের ও আনুগত্যের অসাধারণ অনুশীলন মানুষকে উদ্বেলিত করে তোলে।

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমরা বাংলাদেশ থেকে ২৯ জন ব্যক্তি রাজকীয় মেহমান হিসেবে মনোনীত হয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে জনৈক সচিব, তাঁর সহধর্মিনী, একজন ডিআইজি র‍্যাঙ্কের পুলিশ কর্মকর্তা, জনাদু'য়েক চিকিৎসাবিদ ছিলেন। সচিব মহোদয় প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন। অহংবোধের কেশাগ্র তাঁকে ছুতে পারেনি। তাঁর সহধর্মিনীও তদনুরূপ। সম্ভবত জেদ্দা বিমানবন্দরে আমি আর আমার শ্রদ্ধাভাজন ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম পাশাপাশি বসা। ভদ্রমহিলা এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন, আপনারা সহোদর নাকি? বলাবাহুল্য গায়ের রং আমাদের একই। সে সূত্রে কিংবা পরস্পরের সাথে থাকার কারণে তিনি হয়তো অনুভব করেছিলেন।

আর একজন চিকিৎসক -এখন নামটা মনে নেই - কাকতালীয়ভাবে ভদ্রলোকের গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। তাও আবার আমরা পাশাপাশি থানা ও ইউনিয়নের বাসিন্দা। ভদ্রলোক রাশিয়াতে ডাক্তারীবিদ্যা অর্জন করে সেখানেই ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকায় ফিরে ও আইসি প্রতিষ্ঠিত গাজীপুরস্থ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন।

পুলিশ নাম শুনলে আমরা বিরক্ত হই। কিন্তু আমাদের সহযাত্রী সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। বড়ই মিশুক প্রকৃতির। পুলিশি মেজাজ নেই। সদাহাস্য ও পরিপাটি পুলিশ মানুষটি আমাদের সকলকে আপন করেছিলেন। ছিলেন একজন পীর সাহেব ও বাংলা একাডেমির জনৈক পরিচালক। পীর সাহেব বড়ই বনেদি প্রকৃতির মানুষ। দাওয়াতের জগতে তার পদচারণা তাঁকে মহৎ করে তুলেছিলো। মানুষের মন জয় করে ইসলামের বারতা পৌঁছানো কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার। মঈনউদ্দিন চিশতীর সৌম্যদর্শন চেহারার আধ্যাত্মিক আলোচ্ছটায় বিমুগ্ধ পৌত্তলিকগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংখ্যা কিন্তু নব্বই হাজার ছিলো।

পীর সাহেব অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। অধিকাংশ সময় যিকির আযকার ছিলো তাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচি। বাংলা একাডেমির পরিচালক মহোদয়, বেজায় ভালো মানুষ। সদাহাস্য আভরণ তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিলো। ফেরার দিন দু'য়েক আগে দেখি তিনি আরবদের মতো জুব্বা, ও গামছা কিনে রীতিমতো পোশাকী আরবে পরিণত হয়েছিলেন। এ ধরনের আরো কয়েকজনের উপস্থিত আমাদের

❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৩০] সহীহ বুখারী

সফরটাকে আনন্দঘন করে তুলেছিলো। পরিচালক আমার বন্ধু। চটপটে প্রকৃতির, মননশীল মানুষ হিসেবে সকলের হৃদয় জয় করেছেন। আমাদের আরো দু'জন ছিলেন। ওরা বিমানে চাকুরি করতেন। জেদ্দা বিমান বন্দরের বিমানে আরোহণের সময় দেখি আমাদের সবারই টিকেট বিজনেস ক্লাসে এবং পাশাপাশি। প্রায় পাঁচশত আরোহী নিয়ে বিমানের উড্ডয়ন একটা দারুণ রোমাঞ্চকর বিষয়ে। বিস্তীর্ণ রানওয়ে বেয়ে টেকঅফ করার সময় এক ভীতিপদ পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমরা জানি ২০১৪ সালে একটি মালয়েশিয়ান বিমান উড্ডয়নের পর রাডারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিমান চলাচলের ইতিহাসে সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনাগুলোর একটি।

যতদূর মনেপড়ে বিমানটি Malaysla Airline Flight MH 370 বিমানটি কুয়ালামপুর থেকে বেইজিং যাচ্ছিলো। উড্ডয়নের প্রায় ৪০ মিনিট পর বিমানটির সঙ্গে এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে সামরিক রাডারের তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিমানটি অজ্ঞাত কারণে নির্ধারিত পথ থেকে সরে গিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরছিলো। অতঃপর দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের দিকে দীর্ঘ সময় উড়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। ওই বছর বিমানটি খুঁজে বের করার জন্য মালয়েশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বহুদেশ যৌথভাবে বিমান অনুসন্ধান অভিযান চালায়। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান করা হলেও বিমানে কতিপয় ভগ্নাংশ পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে Reunion দ্বীপে পাওয়া যায় একটি ডানার অংশ (ফ্ল্যাপেরন)। নিশ্চিতভাবে MH 370এর বলে শনাক্ত করা হয়। ভীতির ধুম্রজাল এখানেই।

সম্ভবত বছর দু'য়েক আগে রাজশাহী জমঈয়তের সাংগঠনিক কাজের জন্য গিয়ে বিমানে ঢাকা ফিরছিলাম। বিমানে উঠেই দেখি পাইলট হেঁচকা টানে একবারে উপরে উঠিয়ে নিলেন। উপরে উঠে বিমানটি রীতিমত মুহুর্মুহু ডাম্পিং শুরু করে। আমরা তো দু'আ দুরূদ পড়তে পড়তে অস্থির। যাইহোক, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সে যাত্রা রক্ষা পাই।

এমনি ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বিমানে উঠতে হয়। সুপরিসর বিমান ফেরৎ হাজীরা কানায় কানায় ভরা। পাপমুক্ত হয়ে সহাস্য বদনে কৃতজ্ঞ চিত্তে বাড়ি ফেরার মজায় আলাদা। কুরআনুল কারীমে বিঘোষিত হয়েছে-

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

অর্থ, পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে শোভনীয় করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ?[৩১]

সুপ্রিয়, পাঠক, আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইঙ্গিত অনুধাবন করতেই পারছি না। একই সূরাতে আরো বলা হয়েছে-

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।[৩২]

এ শোভার জালে আমরা রীতিমত আটকে পড়েছি। আল্লাহর ঘর জিয়ারতের সুর্বণ সুযোগকে অবলীলাক্রমে হাত ছাড়া করে কেনাকাটায় অধিকতর সময় ব্যয় করে থাকি, পরলৌকিক ভাবনায় ব্যস্ত না হয়ে দুনিয়াবী লেনদেন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন :

﴿اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾

নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধায় আহ্বান করে তাদের রব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। [৩৩] কার্যত আমরা প্রায় দেড়হাজার বছর বিয়োগের গোড়ায় পৌঁছে ইসলামি বিধি-বিধান সামান্য অনুসরণ করছি। পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করে দেশে ফেরার প্রাক্কালে এমনিতরো হাজারো প্রশ্ন উদিত হয়। চলবে ইন শা-আল্লাহ

---

[৩১] সূরা কাফ আয়াত : ৭।
[৩২] সূরা কাহাফ আয়াত : ৪৬।
[৩৩] সূরা কাহাফ আয়াত : ২৮

সালাফ চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

পর্ব-৪

কাদেসিয়ার যুদ্ধ : সা'দ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে কাদিসিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে তার সৈন্যদলগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে এক মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কোনো পারস্য সেনার মুখোমুখি হননি। পারস্য সেনারা সর্বসম্মতিক্রমে রুস্তম ফাররুখজাদকে সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। রুস্তম গিয়ে সাবাতে শিবির স্থাপন করেন এবং জালিনোসকে চল্লিশ হাজার সৈন্যের অগ্রবর্তী দলের, হুরমুজানকে ডান পার্শ্বের, মেহরান ইবনে বাহরামকে বাম পার্শ্বের এবং আল-বান্দারানকে আশি হাজার সৈন্যের পশ্চাৎবর্তী দলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাদের পেছনে আরো আশি হাজার সৈন্য যোগ দেয়, যা মোট দুই লক্ষ যোদ্ধা এবং তেত্রিশটি হাতিতে পরিণত হয়। অতঃপর সা'দ রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নু'মান ইবনে মুকরিন আল-মুযানি, ফুরাত ইবনে হাইয়ান, হানযালা ইবনে আল-রাবি', আতারিদ ইবনে হাজিব, আল-আশ'আছ ইবনে কায়স, আল-মুগিরাহ ইবনে শু'বাহ এবং আমর ইবনে মা'দিকারিবকে প্রেরণ করলেন। যখন রুস্তম সা'দের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে বিলম্ব করলেন, তখন সা'দ পারস্যদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহের জন্য একটি সেনাদল পাঠালেন। তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদি পারস্য সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করলেন। তিনি তাদের একজনকে বন্দী করে নিয়ে আসলেন এবং সা'দ তাকে পারস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আর সে তুলাইহার বীরত্বের বর্ণনা দিতে শুরু করলো। তিনি বললেন, এসব বাদ দাও, আর আমাদেরকে রুস্তমের কথা বলো। সে বললো, তার সাথে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য আছে এবং সমসংখ্যক সৈন্য তার পিছনে রয়েছে। যখন দুই সেনাবাহিনী মুখোমুখি হলো, রুস্তম সাদকে এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাঠাতে বললেন যিনি তার জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবেন। তাই তিনি তাকে আল-মুগিরা বিন শু'বা-কে পাঠালেন। এরপর সাদ তার কাছে আরেকজন দূত পাঠালেন, যিনি ছিলেন রাবি' বিন আমির এবং তারপর তিনি তাদের কাছে তৃতীয় একজন দূত পাঠালেন, যিনি ছিলেন হুযাইফা বিন মুহসিন আল-বারিকী এবং তিনিও রাবি'র কথার অনুরূপ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বললেন।

রিবঈ বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মুসলিম বিজয়ীদের অন্যতম। তিনি রাসূল ﷺ-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পারস্য ও রোম উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইসলামী বিজয়াভিযানে তার অংশগ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মতো। কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি সা'দ বিন ওয়াক্কাসের সাথে পারস্য সেনাপতি রুস্তমের মাঝে যখন পত্র আদান-প্রদান চলছিল, তখন রুস্তম মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের কাছে একজন দূত পাঠানোর আবেদন করলেন। সাদ বিষয়টি নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে পরামর্শে বসলেন। প্রথমত একাধিক লোক পাঠানোর প্রস্তাব আসে। কিন্তু রিবঈ বিন আমের প্রস্তাব করলেন, আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে একাই পাঠাতে পারেন। পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সাথে আলোচনা করার জন্য আমি একাধিক লোকের বদলে একাই যথেষ্ট হবো এবং আপনারা যে উদ্দেশ্যে পাঠাবেন সেটাও আল্লাহ চাইলে আমার একার দ্বারাই বাস্তবায়িত হবে। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রিবঈর প্রস্তাবটিই গ্রহণ করলেন এবং রুস্তমের সাথে আলোচনার জন্য তাকে একাই পাঠিয়ে দিলেন।

মুসলিমদের দূতের আগমণ বার্তা শুনে পারস্য সেনারা রুস্তমের সিংহাসনটি সোনা দিয়ে এবং তার খাস কামরাটিকে রেশমী কার্পেট দিয়ে সজ্জিত করলো। মুসলিমদেরকে পারস্যদের শান-শাওকত দেখানোর জন্য রুস্তম সেদিন তার মুকুটটিকেও বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র উপস্থিত করেছিলেন। সেদিন তার পুরো মজলিসটাকেই স্বর্ণখচিত কার্পেট ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ দ্বারা সাজিয়েছিলেন।

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

ঐদিকে মুসলিমদের প্রেরিত দূত রিবঈর পরনে ছিল একদম নিম্ন মানের জীর্ণ-শীর্ণ কাপড়, হাতে ছিল একটি ভাঙা তরবারি, একটি ঢাল এবং একটি ছোট্ট লেজকাটা ঘোড়া। এই অবস্থাতেই তিনি রুস্তমের মজলিসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রক্ষীরা প্রথমে তাকে এই অবস্থায় রুস্তমের কাছে প্রবেশ করতে বাধা দিলো। রিবঈ তখন বললেন, আমি এখানে এসেছি তোমরা আমাকে ডেকেছো বলেই। তোমরা যদি আমাকে এভাবে প্রবেশ করতে দাও, তাহলে প্রবেশ করবো। অন্যথায় ফিরে যাবো। রুস্তম তখন বললেন, তাকে আসতে দাও। রিবঈ তার ছোট্ট আকারের ঘোড়ায় আরোহণ করে স্বর্ণখচিত কার্পেটের ওপর দিয়ে এগোতে লাগলেন। ঐদিকে হাতের বর্শা দিয়ে স্বর্ণের কার্পেটে খোঁচা মেরে কয়েক স্থানে ছিদ্রও করে ফেলেছিলেন। পরিশেষে তার দরবারের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং ঘোড়াটিকে সেখানকার কিছু মূল্যবান জিনিষের সাথে বাঁধলেন এবং রুস্তমের কাছে গেলেন। তার হাতে ছিল অস্ত্র, ঢাল এবং তার মাথায় ছিল হেলমেট। তারা তাকে বললো, তোমার অস্ত্র নামাও, তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে আসিনি। তোমরা যখন আমাকে দাওয়াত দিয়েছো, তখনই এসেছি। আমাকে এভাবেই রেখে যাও, অন্যথায় আমি ফিরে যাবো। রুস্তম বললেন, তাকে এভাবেই রেখে দাও। অতঃপর রিবঈ তার বর্শাতে হেলান দিয়ে বসলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের ইবাদত থেকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার বিশালতার দিকে এবং যমীনের ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীনের প্রতি তার সৃষ্টিকে আহ্বান করার জন্য। যে কেউ তা গ্রহণ করবে, আমরা তার থেকে গ্রহণ করবো এবং যে কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তা অস্বীকার করবে, আমরা তার সাথে আমরণ যুদ্ধ করবো, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন করি। তারা বললো, আল্লাহর ওয়াদা কী? তিনি বললেন, জান্নাত। এর জন্য যে মারা যাবে সে জান্নাত পাবে এবং যে বেঁচে থাকবে সে বিজয়ী হবে। রুস্তম তখন বললেন, আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি। আপনি আমাদেরকে সময় দিন। যাতে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারি? রিবঈ বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই চাচ্ছি। তবে কতদিন? একদিন, দুই দিন? রুস্তম বললেন না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের মতের লোকদের এবং আমাদের জনগণের নেতাদের সাথে পরামর্শ করতে পারি। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করতে তিন দিনের বেশি বিলম্ব করার নির্দেশ দেননি। তাই আপনি বিবেচনা করুন এবং তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিন। রুস্তম বললেন, তুমি কি তাদের নেতা? তিনি বললেন : না, কিন্তু মুসলিমরা একটি দেহের মত, তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তি কাউকে নিরাপত্তা দিলে তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি তা রক্ষা করে। অতঃপর রুস্তম তার সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে বললো, তোমরা কি কখনও এই লোকের কথার চেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর কোনো কথা শুনেছো? তারা বললো, আপনি কি এই লোকটির দ্বীনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন? আপনার দ্বীনকে এই কুকুরের কাছে পরাজিত করতে চাচ্ছেন? আপনি কি তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষা দেখতে পাচ্ছেন না? রুস্তম বললেন : হায়! আফসোস তোমাদের জন্য। পোশাকের দিকে তাকিও না : বরং তার প্রজ্ঞা, কথা, সাহসিকতা ও আচার-আচরণের দিকে তাকাও। দেখো! আরবরা পোশাক-পরিচ্ছদ, শান-শাওকত ও খাবার-দাবারকে খুব হালকা মনে করে এবং তারা তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদাকে রক্ষা করে। হে আল্লাহ তোমার সাহায্য চাই।

শিক্ষা : আমাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যারা আলেম ও দাঈদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেসব আলেম খুব পরিপাটি, ফিট-ফাট থাকে, উন্নত পোষাক পরিধান করে ও যারা সুদর্শন তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্য দিকে যারা এগুলোর প্রতি বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না, তাদেরকে সাধারণ লোকেরা মূল্যায়ন করে না। যদিও তাদের যথেষ্ট ইলম রয়েছে। সাধারণ মানুষের মনোভাব বুঝে কিছু আলেমও খুব পরিপাটি ও সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সালাফদের আচার-আচরণ এমন ছিল না। তাদের কাছে ইলম, তাক্বওয়া, আমল ও যোগ্যতাটাই ছিল মূল্যায়ন ও সম্মানের বিষয়। (চলবে ইনশা-আল্লাহ)

ইসলামী দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. রেজাউল করিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(পর্ব-২)

ইসলামি দাওয়াহ প্রদানের গুরুত্ব / أهمية الدعوة

আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদান হচ্ছে মানুষ কর্তৃক আল্লাহকে চেনার মূল ও প্রথম মাধ্যম, যার মধ্যে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহীত। যদি দাওয়াত না থাকত তাহলে মানুষ আল্লাহ-রাসূল-শরীআত, ন্যায়-অন্যায়, শির্ক-বিদআত ..... জানত না, শিখত না।

যদি দাওয়াতী কাজ না থাকত, তাহলে আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রসার প্রতিষ্ঠিত হত না, মানুষ জানত না আল্লাহর হক্ব, রাসূলের অধিকার, জান্নাত কী? জাহান্নাম কী? মানুষ হেদায়াত পেত না বরং অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, শির্ক-বিদআতসহ বিভিন্ন গুনাহের কাজে নিমগ্ন থাকত। দাওয়াতের ফলে মানুষ তাদের ভুল থেকে ফিরে আসে, গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয়। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মুয়ামালাত ক্রয়-বিক্রয়, আখলাক-চরিত্র, বিবাহ-শাদি পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হয় পরিপাটি ও পরিশোধিত ও সুন্দর।

দাওয়াতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত কারণে :-

১। দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়েছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.﴾

'আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে।'[৩৪]

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.﴾

'আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'[৩৫]

২। দাওয়াত প্রদান করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.﴾

'তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।'[৩৬]

নবী ﷺ বলেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

'আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।'[৩৭]

৩। দাওয়াহ প্রদান করা নবী রাসূলগণের কাজ : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে নবী-রাসূল। আর সকল রাসূলগণ আজীবন মানুষদের দাওয়াত প্রদান করেছেন। তারা সকলেই স্ব-স্ব জাতিকে কল্যাণের দিকে, একমাত্র উপাস্যের ইবাদাতের দিকে দাওয়াত দিতেন। সাথে সাথে যতসব অকল্যাণ, ক্ষতিকর

❖ **প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি বাংলাদেশ।**

[৩৪] সূরা ইউনুস আয়াত : ২৫।

[৩৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২২১।

[৩৬] সূরা আন-নাহল আয়াত : ১২৫।

[৩৭] সহীহ বুখারী হা : ৩৪৬১।

বিষয় আছে, শির্ক, বিদআত, খুরাফাত আছে সেসব থেকে বিরত থাকার দাওয়াত দিতেন। আল্লাহ বলেন,

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

'আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোনো অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।'[৩৮]

৪। দাওয়াহ প্রদানে অনেক অনেক সওয়াব পাওয়া যায়:

আপনার দাওয়াতের কারণে কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে ভ্রান্ত, বাতিল আকীদার লোক আকীদাকে শুদ্ধ করলে, বেনামাযী নামাযী হলে, পাপাচার, গুনাহগার পাপ ছেড়ে ভালো তথা নেক হয়ে গেলে, আপনি তাদের মতো নেকীর অধিকারী হবেন, তাদের এবং আপনার কারো নেকী কমানো হবে না। নবী ﷺ বলেন,

فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

'আল্লাহর কসম, তোমাদের দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।'[৩৯]

নবী ﷺ আরো বলেন : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ যে ব্যক্তি কোন উত্তম বিষয়ে পথপ্রদর্শন করে, তার জন্য আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।[৪০]

৫। দাওয়াতী কাজ সর্বোত্তম :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .﴾

'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলেঃ আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'[৪১]

আল্লাহর পথে দাওয়াতের উৎস সমূহ : مصادر الدعوة إلى الله

ইসলামি দাওয়াতের মানহাজ, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মাধ্যমসমূহ যেসব উৎস থেকে আহরিত, তা নানাবিধ হলেও মূলত কিছু ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল সেগুলো হল: কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও -----

দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কুরআনুল কারীম:

শাব্দিক অর্থে কুরআন : কুরআন শব্দটি এসেছে قرأ ক্রিয়া থেকে قراءةً ও قرآناً আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি (فُعلان) ওজনের একটি مصدر যেমন غفران (ক্ষমা) كفران (অস্বীকার)।

ইবনুল আসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : হাদীসে বহুবার القراءة (পাঠ), الاقتراء (পড়া), القارئ (পাঠক) এবং القرآن (কুরআন) শব্দগুলোর উল্লেখ হয়েছে। এ শব্দের মূল অর্থ হলো 'সংগ্রহ করা। কোনো কিছু একত্র করলে বলা হয় : "قرأته" (আমি তা সংগ্রহ করলাম)। একে কুরআন বলা হয়েছে, কারণ এতে কাহিনী, আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী, আয়াত ও সূরাগুলো একত্র করা হয়েছে। তাই এটি غفران ও كفران এর মতো مصدر তথা মূলধাতু।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ইমাম ত্বহাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কুরআনুল কারীমকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন : "কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। এটি তাঁর কাছ থেকে শুরু হয়েছে। কিভাবে হলো তার কোনো বর্ণনা নেই, এটি একটি উক্তি। তিনি তা তাঁর রাসূলের ওপর ওহি আকারে অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ সত্যভাবেই তা গ্রহণ করেছে এবং দৃঢ় বিশ্বাস করেছে যে, এটি বাস্তবে আল্লাহর কালাম। এটি মানুষের কথার মতো সৃষ্ট নয়। যে এ কথা দাবি করবে যে, এটি মানুষের কথা, সে কাফির হয়ে যাবে।[৪২]

هو اللفظ المنزل على النبي ﷺ من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس.

---

[৩৮] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৬৫।
[৩৯] সহীহ বুখারী হা : ৩৭০১।
[৪০] সহীহ মুসলিম, ইঃফাঃ হা : ৪৭৪৬।
[৪১] সূরা হামীম সিজদা আয়াত : ৩৩।
[42] شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ١٦٨).

কুরআন হলো সেই ওহির বাণী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে, নবী ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু, সূরা নাস দ্বারা শেষ।[৪৩]

কুরআনুল কারীম দাওয়াতের প্রধান উৎস : কুরআনুল কারীম হলো ইসলামী দাওয়াতের প্রধান তথা মূল উৎস। এর মধ্যে রয়েছে বহু আয়াত যা দাওয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে এর মধ্যে রয়েছে বহু আয়াত, যেখানে রাসূলগণের আলাইহিস সালাম দাওয়াতের কাহিনী উল্লেখ আছে। কীভাবে তারা তাদের সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের পদ্ধতি কী ছিল, আর সকল নবী রাসূলগণের উম্মতদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, আর আল্লাহ তা'আলা কীভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে দাওয়াতের ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো থেকে দাওয়াতের নীতি-আদর্শ ও মাধ্যম শেখা যায়। যা একজন দাঈর জন্য শেখা আবশ্যক, যেমন অন্যান্য দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা এগুলো আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন, যেন আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানে শক্তি অর্জন করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

'রাসূলদের ঐসব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।'[৪৪]

ইবনু কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে মুহাম্মদ ﷺ আমরা আপনাকে পূর্ববর্তী রাসূলগণের সংবাদ বর্ণনা করি, তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বিতর্ক ও তর্ক কেমন ছিলো, তারা কীভাবে মিথ্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করলেন, আর আল্লাহ কিভাবে তাঁর মুমিনদলকে সাহায্য করলেন এবং শত্রু কাফিরদের ধ্বংস করলেন। এসব আমরা বর্ণনা করি আপনার হৃদয় দৃঢ় করার জন্য, যাতে আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের মধ্যে আপনার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত থাকে।[৪৫]

কুরআন দাঈর জন্য একটি আলো, যা তার পথ উজ্জ্বল করে দেয়, তার সামনে সঠিক রাস্তা তুলে ধরে এবং দাওয়াতের সব মূলনীতি, বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট পরিষ্কার করে দেয়। একই সাথে দাওয়াতের পদ্ধতি, মাধ্যম, সর্বোত্তম কৌশল ও উত্তম উপায়গুলোও কুরআন ব্যাখ্যা করে।

অতএব, একজন দাঈর কর্তব্য হলো, আল্লাহর কিতাবকে যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া,পাঠ করা, মুখস্থ করা, জ্ঞানার্জন করা এর উপর আমল করা, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, এর নির্দেশাবলী মেনে চলা, এর দিকনির্দেশনা আঁকড়ে ধরা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে এর পথ অনুসরণ করা। তদুপরি দাঈর জন্য প্রয়োজন নবী-রাসূলদের অবস্থা ও তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। কিভাবে তারা তাদের জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, মানুষ তাদের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এবং এসব থেকে কীভাবে শিক্ষা নেওয়া যায়। আল্লাহ বলেন :

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾

'এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও, আমি কুরআন ও দীনের তাবলীগের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। এই কুরআন সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য উপদেশের ভাণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়।' *(সূরা আন'আম আয়াত : ৯০)*

ইবন কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ব্যাখ্যায় বলেন : "এখানে উল্লেখিত নবীগণ এবং তাদের পূর্বপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে যারা ছিলেন–তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। 'فبهداهم اقتده' অর্থাৎ তুমি তাদের অনুসরণ করো। আর যদি রাসূল ﷺ কে এভাবে আদেশ করা হয়, তবে তাঁর উম্মতের উপরও সেটি ফরজ–তাদের জন্য তিনি যা শরিয়ত হিসেবে নিয়ে এসেছেন, তারা সেটিই অনুসরণ করবে।[৪৬] চলবে ইনশাআল্লাহ

---

43 مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني (١/١٩).

44 সূরা হূদ আয়াত : ১২০।

45 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ٣١١

46 تفسير القرآن العظيم لابن كثير(٣/ ٢٦٨)

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(১১ তম পর্ব

প্রাচ্যবাদ ও কুরআনবাদের যোগসূত্র :

প্রাচ্যবাদ কুরআনবাদের মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এমনকি যদি বলা হয় যে, আধুনিক কুরআনবাদ পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট তাহলে তা একটু ও বাড়িয়ে বলা হবে না। প্রাচ্যবাদের সাথে কুরআনবাদের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করার আগে প্রাচ্যবাদ বা প্রাচ্যবিদদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব :

প্রাচ্যবাদ বা প্রাচ্যবিদ্যা (orientalism) মূলত পশ্চিমা বিশ্বের প্রাচ্যের তথা মুসলিম বিশ্বের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ইতিহাস নিয়ে গবেষণার একটি শাখা। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ বলতে সেই সকল পশ্চিমা চিন্তাবিদকে বুঝানো হয় যারা মুসলিম বিশ্বের ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি, মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে।[৪৭]

আল মাউসুআতুল আরাবিয়্যাহ আল 'আলিমিয়্যাহ (الموسوعة العربية العالمية) নামক বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে ; প্রাচ্যবিদ্যা বলতে - ইহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত একাডেমিক কিছু আলোচনা, যেখানে বিশেষভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, শারঈ নীতিমালা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়।[৪৮]

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিদের ইসলাম চর্চা শুধু ইসলামী আদর্শ জানার মধ্যে সীমাবধ্য নয় বরং তাদের মূল লক্ষ্য হলো মুসলিমদের মাঝে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন, নাবী ﷺ এর রিসালাহ ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে পশ্চিমা মিশনারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে জয়লাভ করা।

প্রাচ্যের ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে ব্রিটিশদের আগ্রহ শুধু আজকের নতুন নয় বরং বহু আগে থেকেই তারা প্রাচ্যে তাদের কথিত শিক্ষাবিদ নামক মিশনারীদের আগমন ঘটিয়ে। আহমাদ ফারাজ রচিত আল ইশতিরাক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মুসলিম ও রোম তথা ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মের মাঝে সংঘটিত প্রথম লড়াই মুতার যুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সুচনা করে। হিজরীর তৃতীয় শতাব্দী তথা ঈসায়ী অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন থেকে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা শুরু হয় এবং দশম শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্যবিদ্যার উদ্ভব ঘটে। সেই সাথে ইসলাম ও আরব সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয় ১১৪৩ ঈসায়ী সনে এবং সেই সময়ই কুরআন মাজীদ সর্ব প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।[৪৯]

প্রাচ্যের মুসলিম দেশে প্রাচ্যবিদ নামে মিশনারীদের আগমন:

ইসলাম চর্চার বাহানায় খ্রিষ্টান মিশনারীরা একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের মুসলিম দেশ তথা আরব দেশগুলোতে যারা আগমন করে এবং শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. অ্যাডেলার্ড অব বাথ- তিনি ১১৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণকারী প্রথম কোনো ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি স্পেনের অভিযাত্রী যাজকদের অন্যতম ছিলেন।

২. মাইকেল স্কট- তিনি ১১৯০ সালে আগমণ করেন। অ্যাডেলাড অব বাথ-এর পথ অনুসরন করে প্রাচ্যে আগমন করা মাইকেল স্কট আরবী ও হিব্রু ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। ১২৩৬ সালে তিনি মারা যান।

৩. রোজার বেকন- যিনি ১২৯৪ সালে মারা যান। তিনি আরবী ভাষায় ইসলামী আদর্শ বিস্তরভাবে চর্চা করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

৪. উইলিয়াম বিডওয়েল, এডমন্ড কাস্টেল ও আব্রাহাম উইলক- তারা যথাক্রমে ১৬৫৩ ও ১৬৯১ সালে মারা যান।

তাদের মধ্যে **উইলিয়াম বিডওয়েল** আরবী ভাষার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং আরবী ভাষার শিক্ষাগুরুতে পরিণত হন।

৫. জর্জ সেল - তিনি ১৭৩৬ সালে মারা যান। আরবী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থের অনেকগুলো পাণ্ডলিপি তার কাছে ছিলো।

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৪৭] আল মাউসুআতুল মুয়াস্সারা : ২/৬৮৭. ।

[৪৮] ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের সীরাত চর্চা : ৬৪পৃ. ।

[৪৯] আল মুস্তাশরিকুন লিন নাজিব আল আক্বিক্বী : ১/১২০পৃ, ফালসাফাতুল ইশতিরাক : ৬৯পৃ. ।

৬. উইলিয়াম জোন্স - তিনি ১৭৯৪ সালে মারা যান। তিনি তার মিশনারীর কার্যক্রম সহজভাবে পরিচালনার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. অ্যাডওয়ার্ড ল্যান - ১৮৭৬ সালে মারা যান। তার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় তিনি মিসরে কাটিয়েছেন। মিসরে তিনি তার আসল নাম গোপন করে **মানসুর আফেন্দি** নাম ধারণ করেন এবং এ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ নামে পরিচিত ছিলেন **টমাস কার্লাইল** (মৃত্যু - ১৮৮১ঈ.), **অ্যাডওয়ার্ড হেনরী পামার** (মৃত্যু - ১৮৮৩ ঈ.), **উইলিয়াম মুর** (মৃত্যু - ১৯০৫ঈ.) **রিচার্ড বার্টন** (মৃত্যু - ১৮৯০ঈ.)

৮. বিংশ শতাব্দীতেও একঝাঁক প্রাচ্যবিদ নামক মিশনারীদের আগমন ঘটে- তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ; **টমাস আর্নল্ড** (মৃত্যু - ১৯৮০ঈ.), **আলফ্রেড গিয়োম** (মৃত্যু -১৯২৬ঈ.), ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করা এবং কুৎসিতভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে তার তুলনা পাওয়া দুস্কর। আরো ছিলেন **ডেভিড স্যামুয়েল মার্গোনিয়োথ** (মৃত্যু-১৯৪০ঈ.), **রেনোল্ড এ নিকোলসন** (১৯৪৫ঈ.) **আর্থার জন আর্বেরি** (মৃত্যু ১৯৬৯ঈ.)। এছাড়া আরো অনেক মিশনারী রয়েছেন যারা প্রাচ্যবিদ তথা প্রাচ্য বিষয়ক বুদ্ধিজীবির ছদ্মাবরণে ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। [৫০]

উল্লেখিত সকলেই ছিলো ভয়ংকর মিশনারী। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে মুসলিমদের বিচ্যুত করা। আর সেই মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য তারা মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে মিসর, লেবানন ও আরবের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে থাকে, যাতে তারা একঝাঁক ছাত্র তৈরি করতে পারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারে। তাদের মধ্যে **কার্লো আলফোনসো নালিনো, ডেভিড সান্টিলানো, যোসেফ শাখত, টমাস আর্নল্ড, আর্থার আর্বেরি ও কাসানোভার** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকদের চিন্তা চেতনা ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করবেই। এর ফলশ্রুতিতেই **ত্বহা হুসাইন, আহমাদ আমীন, আহমাদ সুবহি মানসুর, ড, রাশাদ খলিফা ও আহমাদ খান**দের মতো ভয়ংকর সব মুনকিরুল হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীদের জন্ম হয়, যারা পুরা মধ্যপাচ্য জুড়ে আধুনিক কুরআনবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচিত।

প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিতে ইসলামের যে বিষয়গুলো আপত্তিকর!

১. প্রাচ্যবিদদের আক্বীদাহ মতে শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আগমন কাল্পনিক ও মিথ্যা।

২. তাদের মতে দাজ্জাল সংক্রান্ত ইসলামে বর্ণিত সমস্ত হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট এবং দাজ্জাল নামক দেহধারী কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর অস্তিত্ব ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

৩. তাদের মতে' নাবী ﷺ এর উপর যাদু সংক্রান্ত সমস্ত হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট।

৪. তাদের মতে' হাদীসে বর্ণিত মি'রাজের ঘটনা মিথ্যা ও বানোয়াট।

৫. إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً»

৬. তোমাদের কারো পানীয় পাত্রে মাছি পতিত হলে সে যেনো তাকে ডুবিয়ে দেয় তারপর তা উঠিয়ে ফেলে দেয়, কারণ তার এক বাহুতে রোগ থাকে এবং অপর বাহুতে আরোগ্য থাকে।[৫১]

তাদের মতে এ হাদীসটি মিথ্যা ও বানোয়াট।

৭. তাদের দাবি অনুযায়ী তাক্বদীরের বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদীস মিথ্যা ও জাল।

৮. তাদের মতে মুসা আলাইহিস সালাম ও মালাকুল মাউত সংক্রান্ত সকল হাদীস মিথ্যা ও জাল।

৯. ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে শয়তান স্পর্শ করার হাদীসগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট।[৫২]

১০. প্রাচ্যবিদ গোল্ড যেহের বলেন; ইসলামে হাদীসের নামে যে সুবিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তা নাবী ﷺ এর কথা নয় বরং এগুলো হিজরী প্রথম তিন শতাব্দীতে আবিষ্কার করা হয়েছে।

১০. প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মুরের দাবি হলো মুহাম্মাদ ﷺ নিরক্ষর নবী ছিলেন না বরং মরুচারী আরবরা যে আরবী ভাষার সাহিত্য, অলঙ্কার ও বাগ্মিতার নিপুণ চর্চা করতেন তাদের থেকে আরবী ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করেছেন। এবং অপর প্রাচ্যবিদ মারজিলিউসসহ অন্যান্য প্রাচ্যবিদরাও এটা নকল করে প্রচার করে থাকে।[৫৩]

---

[৫০] আল ইশতিরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : ২/২৫৬, ২৫৮, ২৫৯ পৃ. ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের সীরাত চর্চা : ৭০-৭৫ পৃ.।

[৫১] সহীহ বুখারী হা : ৩৩২০।

[৫২] মাউসুআতুল ফিরাকিল মুস্তাসাবাহ : ৪/৩০৮পৃ.।

[৫৩] প্রাচ্যবিদদের ইসলাম চর্চার নেপথ্যে : ৬৮পৃ.।

একটু লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রাচ্যবিদরা তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মিশনারীরা ইসলামের যে বিষয়গুলো নিয়ে আপত্তি তুলে মিথ্যাচার করেছে, ঠিক সেই বিষয়ে মিসরীয় ও ভারতবর্ষের আধুনিক কুরআনবাদীরাও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলছে ও মিথ্যাচার করেছে। সুতরাং কুরআনবাদী মতবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রাচবিদদেরই সৃষ্টি এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

টমাস ওয়াকার আর্নল্ড ও আহমাদ খাঁন :

টমাস ওয়াকার আর্নল্ড ছিলেন একজন ভয়ঙ্কর প্রাচ্যবিদ। আর তার সাথে ভারত বর্ষের কুরআনবাদের নেতা আহমাদ খাঁনের গভীর সম্পর্ক ছিলো। আহমাদ খাঁন মুসলিম নেতার পরিচয় বহন করলেও পশ্চিমা সভ্যতাই ছিলো তার একমাত্র জীবনাদর্শ। তিনি দ্যা মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যা পরবর্তীতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায়। আর এই কলেজে আহমাদ খাঁন টমাস ওয়াকার আর্নল্ডকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করে। এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের সাথে খ্রিষ্টান ধর্মও সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। প্রাচ্যবিদ নামক মিশনারীরা ইসলামকে মোহামেডান বা মুহাম্মাদী ধর্ম বলে প্রচার করার চেষ্টা করতো যাতে করে ইসলাম ধর্ম ঐশী কোনো ধর্ম নয় বরং এটা মুহাম্মাদের বানানো ধর্ম বলে প্রচারণা চালানো যায়। আর মিশনারীদের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্যই মোহামেডান নামে এ কলেজ স্থাপন করা হয় এবং সেখানে ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান করা হয়। এ কলেজের শিক্ষা কারিকুলামের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিলো আহমাদ খাঁনের হাতে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিশনারী প্রাচ্যবিদদের গড়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ধর্মীয় জীবনে বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলশ্রুতিতে আহমাদ খাঁনের হাত ধরেই ভারতবর্ষে খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী কাদিয়ানী মতবাদ ও কুরআনবাদের মতো ঘৃণ্য মতবাদের জন্ম হয়।[৫৪]

একটি পর্যালোচনা :

উপরিউক্ত সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুনকিরুল হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারী ফেরকা রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে এবং বর্তমান সময়ে তা বিপজ্জনক রূপ লাভ করেছে। তবে উৎপত্তি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে কুরআনবাদী ফেরকাকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. বিভিন্ন বাতিল ফেরকা থেকে সৃষ্ট কুরআনবাদ : রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর খেলাফতকালে ইসলামের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বাতিল ফেরকার উদ্ভব ঘটেনি। তৃতীয় খলিফা উসমান বিন আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অর্ধ খেলাফত পরবর্তী সময়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ করার মিথ্যা নাটকের মাধ্যমে ইসলামে প্রথম আনুষ্ঠানিক বাতিল ফেরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা সাবাঈ মতবাদ নামে ইতিহাসে পরিচিত। আব্দুল্লাহ বিন সাবার নামানুসারে এ মতবাদের নাম সাবাঈ রাখা হয়। আর এ সাবাঈ মতবাদই শী'আ মতবাদ। পরবর্তীতে শী'আ মতবাদ বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হলেও আক্বীদাহ ও মানহাজে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। তাদের বিশ্বাস মতে সমস্ত সাহাবা মুরতাদ বিধায় তাদের বর্ণিত কোনো হাদীস সত্য নয়। শী'আ থেকে সৃষ্ট খারেজী মতবাদের মতে সমস্ত সাহাবা কাফের ও মুরতাদ, কাজেই তাদের কোনো বর্ণনা সত্য নয়। শী'আ ও খারেজী থেকে সৃষ্ট মু'তাযিলা, মুরজিয়া, মুশাব্বিহা, কুল্লাবিয়া, জাবারিয়া ও জাহমিয়্যাসহ সকল ফেরকাই কোনো না কোনোভাবে মুনকিরুল হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারী। তবে তারা আত্মস্বীকৃত বা ঘোষিত কুরআনবাদ নয়।

আত্মস্বীকৃত বা ঘোষিত কুরআনবাদ : যাদের মূল দাবিই হলো শুধুমাত্র কুরআনের ওপর নির্ভর করা এবং সমগ্র হাদীস অস্বীকার করা। এরা মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তরালে প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে দলে দলে প্রাচ্যবিদদের আগমন ঘটে এবং তারা আরবী ভাষা, ইসলাম ও মুসলিমদের কৃষ্টি কালচার ও আদর্শ সম্পর্কে অধ্যয়ন করে এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করে, যাতে তারা তাদের মিশন বাস্তবায়নের জন্য একদল ছাত্র তৈরি করতে পারে। তারা মূলত পাশ্চাত্য মিশনারি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুদ্ধিজীবি এজেন্ট। এদের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের মাঝে পশ্চিমা শিক্ষা আদর্শ ও সভ্যতাই একমাত্র আধুনিক এটা প্রমাণ করা। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে ত্বোহা হুসাইন, আহমাদ সুবহি মানসুর, ড. রাশাদ খলিফা, ড. আহমাদ আমীন, ভারত বর্ষের আহমাদ খাঁন ও গোলাম আহমাদ পারভেজদের মতো ছাত্র তৈরি করে ফেলে। যারা মূলত প্রাচ্যবিদদের শধু ছাত্রই নয় বরং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসও বটে। আর পশ্চিমা দাসদের হাত ধরেই আধুনিক কুরআনবাদের উত্থান ও বিস্তার ঘটেছে এবং ঘটছে। সুতরাং আধুনিক কুরআনবাদকে পশ্চিমা দাসত্ববাদ বা প্রাচ্যবাদের দাসত্ববাদ বললে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। (চলবে...)

[৫৪] আদ-দাওয়া আলাল ইশতিরাক : ২৯-৩০পৃ.।

নির্মল হৃদয়

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ❖

[পূর্ব প্রকাশের পর]

সাহাবীদের হৃদয় নির্মল রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগ্রহ

নবী-সহধর্মিণী সাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। সাফিয়্যাহ তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অতঃপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নবী ﷺ বললেন, তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়ায়্যী রাযিয়াল্লাহু আনহা। এতে তাঁরা দু'জনে 'সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল' বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী ﷺ বললেন. শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।'[৫৫]

একটু খেয়াল করে দেখুন তো! রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে নিজের ব্যাপারে সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করতে চেয়েছেন, যাতে কেউ তাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা না করে। একই সঙ্গে তিনি তাঁর সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-কে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যদের সম্পর্কে কু-ধারণা থেকে তাদের অন্তর যেন পবিত্র ও নিরাপদ থাকে। উক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। মুমিনের অন্তরকে সন্দেহ ও কুধারণা থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা সুন্নাহ। বড় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করা দোষের নয়; বরং এটি উত্তম আদব। শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে সদা তৎপর। সর্বোপরি নির্মল হৃদয় গঠনের জন্য পারস্পরিক স্বচ্ছতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য।

সাহাবীদের অন্তরের পবিত্রতা :

অন্তরের পবিত্রতা আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। আর এ গুণে সর্বাগ্রে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, যাদের আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে প্রশংসা করে বলেছেন, 'আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যেও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।'[৫৬]

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, "এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতি লোক আসবে।" তখন আনসারদের একজন লোক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর দাড়ি অযুর পানিতে ভেজা ছিল এবং তিনি বাম হাতে জুতা ধরে ছিলেন। পরদিন রাসূল ﷺ আবার একই কথা বললেন। তখনও সেই একই ব্যক্তি এলেন। তৃতীয় দিনও রাসূল ﷺ একই কথা বললেন এবং আবার সেই ব্যক্তিই এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পেছনে গেলেন এবং বললেন, "আমার বাবার

❖ *আরবী প্রভাষক, হানাইল নো'মানিয়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট ও সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস জয়পুরহাট জেলা।*

[৫৫] সহীহ বুখারী হা : ২০৩৫ ।

[৫৬] সূরা আল-হাশর আয়াত : ৯-১০।

সঙ্গে আমার কিছু মনোমালিন্য হয়েছে। আমি শপথ করেছি যে, তিন দিন তাঁর বাড়িতে যাব না। আপনি যদি আমাকে এই তিন দিন আপনার কাছে থাকার অনুমতি দেন, তাহলে ভালো হয়।" লোকটি বললেন, "ঠিক আছে।" আনাস ﵁ বলেন, আব্দুল্লাহ ﵁ পরে বলতেন, তিনি সেই ব্যক্তির সঙ্গে তিন রাত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে রাতে বিশেষ কোনো নফল ইবাদত করতে দেখলেন না। শুধু যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন বা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন, তখন আল্লাহর যিকির করতেন এবং তাকবীর বলতেন। এরপর ফজরের সলাতের জন্য উঠতেন। আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, আমি তাঁকে সবসময় ভালো কথাই বলতে শুনেছি। তিন দিন শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, "আসলে আমার বাবা ও আমার মধ্যে কোনো ঝগড়া বা সম্পর্কচ্ছেদ ছিল না। আমি শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার বলতে শুনেছি, 'এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতি লোক আসবে।' আর তিনবারই আপনি এসেছেন। তাই আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম, যাতে আপনার আমল দেখে তা অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আমি তো আপনাকে তেমন বেশি আমল করতে দেখিনি। তাহলে কোন গুণের কারণে আপনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন?" লোকটি বললেন, "তুমি যা দেখেছ, আমার আমল তো সেটুকুই।" আব্দুল্লাহ ﵁ চলে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে আবার ডাকলেন এবং বললেন, "তুমি যা দেখেছ, আমার আমল সেটুকুই। তবে একটি বিষয় আছে, আমি কোনো মুসলিমের প্রতি অন্তরে কোনো বিদ্বেষ বা প্রতারণার মনোভাব রাখি না এবং আল্লাহ কাউকে কোন কল্যাণ দান করলে, তার জন্য আমি তাকে হিংসা করি না।" তখন আব্দুল্লাহ ﵁ বললেন, "এই গুণই আপনাকে সেই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। আর এটাই সেই বিষয়, যা অর্জন করা আমাদের জন্য খুব কঠিন।"[৫৭]

নিম্নের ঘটনা দু'টিতে আলী ইবনু আবি তালিব ﵁-এর নির্মল হৃদয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। আলী ﵁ যুদ্ধের পর একটি উপত্যকায় তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ﵁-কে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ধুলো মুছে দিতে লাগলেন। অথচ এর আগে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তখন আলী ﵁ বললেন,

عَزِيزٌ عَلَيَّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْ أَرَاكَ مُجَنْدَلًا فِي الْأُدِيَةِ، تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ، إِلَى اللَّهِ أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي .

"হে আবু মুহাম্মাদ! আপনাকে এভাবে উপত্যকায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আসমানের নক্ষত্রমালার নিচে এ দৃশ্য আমাকে ব্যথিত করছে। আমি আমার অন্তরের সব দুঃখ-কষ্ট ও গোপন বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।" ইমাম আসমাঈ ﵀ বলেন, এখানে عُجَرِي وَبُجَرِي বলতে বোঝায়, আমার অন্তরের গোপন কথা, দুঃখ ও বেদনাগুলো, যা আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৫৮]

এছাড়াও তালহা ﵁-এর মুক্তদাস আবু হাবীবাহ বলেন, আমি ইমরান ইবনু তালহাকে সঙ্গে নিয়ে জামালের যুদ্ধের পর আলী ইবনু আবি তালিব ﵁-এর কাছে গেলাম। তিনি ইমরানকে সাদরে গ্রহণ করলেন, কাছে বসালেন এবং বললেন, "আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে এবং তোমার পিতাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾

'আমি তাদের অন্তর থেকে সব হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেব। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে।'[৫৯] উপরোল্লিখিত ঘটনাদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামদের ﵃ মধ্যে কোনো মতভেদ বা যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তারা পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করতেন না। সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বজায় থাকতো। তাই দেখা যায়, আলী ﵁ তালহা ﵁-এর শাহাদাতে গভীরভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং জান্নাতে পুনরায় মিলিত হওয়ার আশা প্রকাশ করেছিলেন।

[৫৭] সহীহ বুখারী হা : ২০৩৫ ।

[৫৮] ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[৫৯] সূরা আল-হিজর আয়াত : ৪৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

নিম্নোক্ত ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্মল হৃদয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে ইবনু বুরাইদা বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে গালিগালাজ করার জবাবে বললেন, "তুমি আমাকে গালি দিচ্ছ, অথচ আমার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, ১. আমি যখন আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত পড়ি, তখন আমার ইচ্ছা হয়, সব মানুষ যদি আমার মতো এর জ্ঞান লাভ করত। ২. আমি যখন শুনি মুসলিমদের কোনো শাসক ন্যায়বিচার করছে, তখন আমি খুশি হই, যদিও আমি তার কাছে কখনো বিচার চাইতে না-ও পারি। ৩. আমি যখন শুনি মুসলিমদের কোনো এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে, তখন আমি খুশি হই, যদিও আমার কোনো পশুও সেখানে নেই।"[৬০]

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে যায়দ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন, তার অসুস্থকালে কিছু লোক তার কাছে গেলেন, তখন দেখা গেল তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনার মুখ এত উজ্জ্বল কেন?" জবাবে তিনি বললেন, "আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী যে দুটি বিষয় আছে তাহলো- ১. আমি কখনো এমন কথা বলিনি যা আমার কোনো কাজে লাগে না। ২. আর আমার অন্তর সব মুসলমানের জন্য পরিষ্কার ও কল্যাণকামী ছিল।"[৬১] তাই বলা যায়, সাহাবীদের অন্তর ছিল হিংসা-মুক্ত ও কল্যাণকামী। তারা নিঃস্বার্থভাবে অন্যের ভালো দেখে খুশি হতেন। বস্তুত সত্যিকারের সুখ আসে অন্তরের পবিত্রতা থেকে, বাহ্যিক সম্পদ থেকে নয়।

অতএব, সাহাবীদের নির্মল হৃদয়ের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের একটু তুলনা করে দেখুন তো! পার্থক্য কত বিশাল, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ পর্যায়ে আমরা বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয় লাভের উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আলেমগণ এমন কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন, যা মানুষকে বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

প্রথমত : إخلاص العمل لله وحده তথা একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই।'[৬২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আমরা তো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আহার করাই; তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।'[৬৩]

মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।'[৬৪]

যায়েদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিনটি বিষয় এমন, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে কোনো মুসলিমের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না, ১. আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করা, ২. মুসলিম শাসকদের কল্যাণ কামনা করা, ৩. মুসলিম জামা'আতের সঙ্গে থাকা।'[৬৫] উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই তিনটি গুণ মানুষের অন্তর থেকে বিদ্বেষ, কপটতা ও হিংসা দূর করে। কারণ, শির্ক হৃদয়কে ভীষণভাবে কলুষিত করে, আর মানুষের প্রতি প্রতারণা অন্তরে রোগ সৃষ্টি করে। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জামা'আত থেকে বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়া হৃদয়কে নষ্ট করে। আর এসব রোগের চিকিৎসা হলো, ইখলাস তথা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া, পরস্পরের প্রতি সদুপদেশ প্রদান ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।[৬৬] উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনুল আসীর রহিমাহুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এই তিনটি গুণ হৃদয়কে সংশোধন করে। যে ব্যক্তি এগুলো আঁকড়ে ধরে, তার হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।"[৬৭]❑❑

---

[৬০] সিফাতুস সাফওয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৪।
[৬১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।
[৬২] সূরা আন'আম, আয়াত : ১৬২-১৬৩।
[৬৩] সূরা আল-ইনসান, আয়াত : ৯।
[৬৪] সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত : ৫।
[৬৫] মুসনাদে আহমাদ, হা : ২১৫৯০।
[৬৬] ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০।
[৬৭] আন-নিহায়া ফি গারীবিল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১।

তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

আব্দুর রউফ ❖

(২য় পর্ব)

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে হাদীসবিশারদদের মতামত :

ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন,

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله ورسله فان كان باطلا لم تصدقوه وان كان حقا لم تكذبوه.

“আহলুল কিতাব ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান-এর রেওয়ায়াতকে তোমরা সত্যও বলো না মিথ্যাও বলো না; বরং শুধু এ কথা বলো যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তাদের বাতিল রেওয়ায়াতকে তোমরা সত্যে পরিণত করো না এবং সত্য রেওয়ায়াতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না।”[৬৮]

এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ ইসরাঈলী রেওয়ায়াতকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে যা সহীহ প্রমাণিত হবে, তা বিশুদ্ধ বলে গৃহীত হবে।

২. কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে যা মিথ্যা ও বাতিল বলে প্রমাণিত হবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

৩. যেসব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ নীরব, সেক্ষেত্রে আমাদেরও নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। সেসব রেওয়ায়াতকে মিথ্যাও বলা যাবে না, সত্যও বলা যাবে না। তবে তা রেওয়ায়াত করা বৈধ।[৬৯]

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মুফাসসিরদের মতামত:

ইসরায়েলি রেওয়ায়াত (আহলে কিতাবদের বর্ণনা) সম্পর্কে মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা একে সাধারণভাবে কয়েকটি অবস্থায় ভাগ করেছেন-

১. কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত বর্ণনা :

যেসব ইসরায়েলি রেওয়ায়াত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

অর্থাৎ, শরীয়তের মূল উৎস যেটাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেটি গ্রহণ করা যাবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বর্ণনা :

যেসব রেওয়ায়াত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিরোধী, সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এগুলো গ্রহণ করা বা বর্ণনা করা জায়েজ নয়, কারণ এতে ভুল আকিদা সৃষ্টি হতে পারে।

৩. নিরপেক্ষ

অনেক বর্ণনা আছে যেগুলোর সত্য-মিথ্যা কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়নি।

এ ধরনের ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী না সত্য বলা যাবে, না মিথ্যা বলা যাবে; বরং নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে।

৪. বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া শুধু উল্লেখ করা :

কিছু মুফাসসির বলেন, অনেক সময় এসব রেওয়ায়াত শুধু কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা যায়, তবে তার ওপর আকিদা বা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

মুফাসসিরদের মতে ইসরাঈলি রেওয়ায়াত অন্ধভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা তিনটি মূল নীতির মাধ্যমে যাচাই করতে হবে- কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিল, বিরোধিতা, নিরপেক্ষতা (তাওক্কুফ) যথা-

❖ পিএইচ.ডি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা। সাবেক শুব্বান সভাপতি, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

[৬৮] আস-সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবনুল আশআস *সুনান আবী দাউদ*, ১ম সং ২য় খ. (বৈরুত : দারুল জিনান, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ৩৪২।

[৬৯] আস-সুযুতী (১৯৭২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১. ইমাম ইবনে জারির তাবারি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ অনেকে তাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তারা এসব রেওয়ায়াত এর সাথে সনদ উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা সহীহ, যয়ীফ, বা জাল কিনা এর কোনো বিবরণ দেননি।

২. ইমাম বাগাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ অনেকে ইসরায়েলি রেওয়ায়াত তাদের তাফসীর গ্রন্থে' এনেছেন। কিন্তু তার সনদ উল্লেখ করেননি। যেখানে যা পেয়েছেন সবই কিতাবে সংকলন করেছেন।

৩. ইমাম ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)সহ অনেকে তাদের তাফসীর কিতাবে ইসরাঈলি রেওয়ায়াত এনেছেন এবং তা সহীহ, যয়ীফ, বা জাল কিনা এর বিবরণও দিয়েছেন ।

৪. মুহাম্মাদ রশিদ রেজাসহ অনেকে তাদের তাফসীর গ্রন্থে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করেননি।

ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করা বৈধ, তাই সালফে সালিহীন নিঃসংকোচে কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা সত্যায়িত ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করতেন। এ মর্মে নবী ﷺ থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন- "তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর তাতে কোনো দোষ নেই[৭০] এবং আমার থেকেও হাদীস বর্ণনা কর তবে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রেওয়ায়াত করো না।"[৭১]

ইসরাঈলী বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অভিমত -

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد.

অর্থাৎ, বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতির সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তা থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারে না।[৭২] তিনি ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

(১) যেগুলোর সত্যতা স্বয়ং আমাদের এখানেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীসের অনুরূপ কোনো বর্ণনা বানী ইসরাঈলের কিতাবেও পাওয়া যায়। এটার সত্যতায় কোনো মতবিরোধ নেই।

(২) যেগুলো মিথ্যে হওয়ার প্রমাণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ওটা কোনো আয়াত বা হাদীসের উল্টো। ওটা অসত্য হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই।

(৩) যেগুলোকে আমরা না পারি মিথ্যা বলতে না পারি সত্য বলতে। কারণ আমাদের নিকট এমন কোনো বর্ণনা নেই যা অনুরূপ হওয়ার কারণে আমরা তাকে সঠিক বলতে পারি বা এমন কোনো বর্ণনা নেই যা ওর উল্টো এবং যার ওপর ভিত্তি করে আমরা ওকে মিথ্যে বা ভুল বলতে পারি।

এজন্য এই তৃতীয় প্রকারের বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আমরা নীরব রয়েছি। আমরা ওগুলোকে ভুলও বলি না, সঠিকও বলি না। তবে ঐগুলো বর্ণনা করা বৈধ। এই বর্ণনাগুলোও এরূপ যে, ওতে আমাদের ধর্মের কোনো উপকার নেই। তাছাড়া এরূপ কথার বর্ণনায় স্বয়ং আহলে কিতাবের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ বিদ্যমান রয়েছে এবং এই একই কারণে ঐ বর্ণনাগুলো গ্রহণকারী মুফাসসিরগণের মধ্যে এইরূপই মতভেদ পাওয়া যায়।[৭৩]

---

[৭০] *সুনান আবূ দাউদ* হা : ৩৬২১. ইফাবা। حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا على

[৭১] *সহীহ মুসলিম* হা : ৭২৩৮. ইফাবা।

[৭২] *তাফসীর ইবনে কাসীর* : দারুত তায়্যিবা প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৯/১৪২০, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃ.।

[৭৩] *তাফসীর ইবনে কাসীর* : প্রাগুক্ত, ৩২ পৃ.। ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك. كما يَذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعِدّتهم، وعصا موسى من أيّ شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضُرِبَ به القتيلُ من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز.

এ ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণনা করা দ্বারা বিশেষ কোনো উপকার নেই। ইবনে কাসীর (রহমাহুল্লাহি আলাইহি) বলেন, স্বয়ং কুরআনুল কারীম সূরা কাহাফের ২২ নং আয়াতে এ ধরনের বর্ণনার ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

অর্থাৎ, 'অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলে, তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেউ কেউ বলে, তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর; আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিল সাত জন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর; আপনি বলুন, আমার রব তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না'।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বিভিন্ন ইসরাঈলি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আর সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন-

১. ইসরাঈলি রেওয়ায়াত এবং তাদের মতভেদ বর্ণনা করা জায়েয।

২. ওই রেওয়ায়াতগুলোর মধ্য হতে যেগুলো ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর ভুলের ওপর সতর্কও করে দেওয়া উচিত। যেমন প্রথম দুটি মতকে আল্লাহ তা'আলা رَجْمًا بِالْغَيْبِ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. যে রেওয়ায়াতের ভুল হওয়ার ওপর কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যাবে না, সেটার ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় বর্ণনার ওপর চুপ রয়েছেন।

৪. এই রেওয়ায়াতগুলোর সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত জ্ঞান রাখেন।

৫. এই রেওয়ায়াতগুলোর ক্ষেত্রে অধিকতর তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকা উচিত।

৬. এই ধরনের রেওয়ায়াতের ব্যাপারে অধিক তাহকিক ও খুঁটিনাটি তালাশে উঠে পড়ে লেগে যাওয়া জায়েয নয়। কারণ, এগুলোর সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের উল্লেখযোগ্য কোনো কল্যাণ সম্পৃক্ত নয়।[৭৪] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

[৭৪] [৭৪] তাফসীর ইবনে কাসীর: প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃ.।

ফাসিকের পরিচয়, হুকুম, বৈশিষ্ট্য ও তার পরিণতি

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ ❄

ভূমিকা

ইসলামে ঈমান, ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বিধান অমান্য করে ও প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, সে মূলত ফাসিক। ইসলামের দৃষ্টিতে ফাসিক হওয়া একটি ভয়াবহ অবস্থা, যা ব্যক্তির ঈমান, সমাজ এবং পরকালের পরিণতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। নিচে ফাসিকের পরিচয়, হুকুম, বৈশিষ্ট্য ও তার পরিণতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো।

❖ ফাসিকের পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ :

'ফাসিক' (الفاسق) শব্দটি আরবী 'فسق' (ফিসক) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা, সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, আল্লাহর আদেশ অমান্য করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

উদাহরণস্বরূপ, আরবী ভাষায় যখন একটি খেজুরের বীজ তার খোলস (আবরণ) থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সেটাকে "فَسَقَتِ التَّمْرَةُ" বলা হয়। অনুরূপভাবে, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে, তখন তাকে 'ফাসিক' বলা হয়।

খ. পারিভাষিক অর্থ :

শরীয়তের পরিভাষায় ফাসিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে এবং প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে।

❄ আক্বীদাহ ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

ইবনে মানজুর বলেন, ফাসিক হলো আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া।[৭৫]

রাগিব আল-আসফাহানি বলেন, ফাসিক হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে।[৭৬]

ফাসিকের প্রকারভেদ

* ফাসিক প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. আকীদাগত ফাসিক (الفاسق في العقيدة) বা বড় ফাসিক- যে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।[৭৭] এটি এমন ফাসিক, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন : দ্বীনের অপরিহার্য কোনো বিষয় অস্বীকার করা, বিশ্বাসগত মুনাফিকী আচরণ এবং কুফরী ও বিদ'আতী বিশ্বাস লালন করা অর্থাৎ যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভান করে কিন্তু অন্তরে কুফর লালন করে ইত্যাদি।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক।'[৭৮]

এ প্রকারের হুকুম :

ক. এই ফাসিক মুসলিম নয়, বরং কাফের বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হিসেবে গণ্য হবে।

খ. ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী, তার ইসলামী অধিকার যেমন মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন, মুসলমানদের জানাযা, মুসলমান উত্তরাধিকারীদের সম্পদ পাওয়া ইত্যাদি বাতিল হয়ে যাবে।

গ. এ ফাসিকের সঙ্গে মুসলিমদের বৈবাহিক সম্পর্ক টেকে না। আল্লাহ বলেন,

﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে এবং কুফরীর সাথে লিপ্ত থাকে, সে ফাসিকদের অন্তর্ভুক্ত।'[৭৯] ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

[৭৫] লিসানুল আরব, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩১০।
[৭৬] মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, পৃষ্ঠা ৩৮৪।
[৭৭] তাফসীর আত-তাবারি, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩১৮।
[৭৮] সূরা আত তাওবাহ আয়াত : ৬৭।

من أنكر أمراً ضرورياً من الدين، فقد كفر وارتد عن الإسلام

যে ব্যক্তি দ্বীনের অপরিহার্য কোনো বিষয় অস্বীকার করে, সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।[৮০]

২. আমলগত ফাসিক (الفاسق في العمل) বা ছোট ফাসিক- যে বড় গুনাহ করে, যেমন মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।[৮১] এটি এমন ফাসিক, যা ইসলাম থেকে বের করে না, তবে বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : মদপান করা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, সুদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

‘আর যারা সতী নারীদের অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না, তাদের আশি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। কারণ, তারাই ফাসিক।[৮২]

এ প্রকারের হুকুম :

ক. এই ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থাকবে, তবে গুনাহগার (ফাসিক) হিসেবে গণ্য হবে।

খ. ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো যেমন জানাযা, মুসলিম উত্তরাধিকার, বিবাহ ইত্যাদি তার জন্য প্রযোজ্য থাকবে। তবে সে ইসলামী নেতৃত্ব, সাক্ষ্যগ্রহণ, ইমামতি ইত্যাদির যোগ্য নাও হতে পারে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

‘যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা যাচাই করো।’ ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

من وقع في الكبائر لكنه يؤمن بالله ورسوله، فهو مسلم عاصٍ، ولكن لا تُقبل شهادته ولا يُولّى في المناصب الشرعية.

‘যে ব্যক্তি বড় গুনাহ করে কিন্তু ঈমান রাখে, সে গুনাহগার মুসলিম। তবে তার সাক্ষ্যগ্রহণ ও নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ফাসিক দুই প্রকার : বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ফাসিক হলো প্রকাশ্য পাপাচার, আর অভ্যন্তরীণ ফাসিক হলো অন্তরের কপটতা, হিংসা ও রিয়া। উভয় প্রকার ফাসিকই মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে।[৮৪]

❖ **ফাসিকদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :** কুরআন ও হাদীসে ফাসিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের কিছু চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা তাদের চেনা যায়।

(১) আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ অমান্য করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে, এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।”[৮৫]

(২) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক।”[৮৬]

(৩) সমাজে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আল্লাহ বলেন,

﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

‘যখন তাদের বলা হয়, ‘তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না,’ তখন তারা বলে, ‘আমরা তো শুধু

[৭৯] সূরা আন-নাহল আয়াত : ১০৬।
[৮০] মাজমূ‘ ফাতাওয়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৮৭।
[৮১] তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৫।
[৮২] সূরা আন-নূর আয়াত : ৪
[৮৩] আল-মাজমু, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২০।
[৮৪] মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫।
[৮৫] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৪।
[৮৬] সূরা আল -মায়িদাহ আয়াত : ৪৭।

সংশোধনকারী।' জেনে রাখো, নিশ্চয় তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।'[৮৭]

(৪) সত্য গোপন করা ও মিথ্যা বলা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

'যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।'[৮৮]

(৫) হারামকে হালাল মনে করা। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾

'আর তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে, আর যা হালাল করেছেন, তা হারাম করে, এবং তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।'[৮৯]

(৬) মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

'মুনাফিকের (ফাসিকদের অন্তর্ভুক্ত) তিনটি লক্ষণ রয়েছে:

(ক) যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, (খ) যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তা ভঙ্গ করে এবং (গ) যখন আমানত রাখা হয়, তখন তাতে খিয়ানত করে।"[৯০]

(৭) সলাত ও অন্যান্য ইবাদতে অলসতা করা। রাসূল ﷺ বলেন,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

'এটাই হলো মুনাফিকের (ফাসিকদের) সলাত! সে সূর্যের দিকে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না এটি শয়তানের শিংয়ের মধ্যে চলে যায় (ডুবে যায়), তারপর দ্রুত চার রাকা'আত সলাত পড়ে, কিন্তু এতে সে খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ

(৮) মানুষের নামে কুৎসা রটনো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

'যে ব্যক্তি পরনিন্দা করে (নামীমাহ করে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৯১]

(৯) হারাম ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকা। রাসূল ﷺ বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

'আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক থাকবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।'[৯২]

(১০) অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেওয়া এবং যুলুম করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

المسلمُ من سَلِمَ المسلمون من لسانِه ويدِه.

'মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।'[৯৩]

এ ছাড়া আল্লাহর সাথে শির্ক করা, চুরি করা, ধোঁকা দেওয়া, সুদ আদান-প্রদান, ঘুষ গ্রহণ, দুর্নীতি, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সলাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করাসহ আরো অনেক ফাসিকী কাজ রয়েছে, যে কাজগুলো করলে বড় ধরনের গুনাহ হবে; এমনকি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

❖ ফাসিকদের পরিণতি :

ফাসিকদের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

১. ফাসিকরা পথভ্রষ্ট, তারা কখনো হেদায়েত পাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

[৮৭] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১১-১২।
[৮৮] সূরা আন-নাহল আয়াত : ১০৫।
[৮৯] সূরা আন-নাহল আয়াত : ১১৬।
[৯০] সহীহ বুখারী হা : ৩৩; সহীহ মুসলিম হা : ৫৯১৫
[৯১] সহীহ মুসলিম হা : ১০৫; সহীহ বুখারী হা : ৬০৫৬।
[৯২] সহীহ বুখারী হা : ৫৯০।
[৯৩] সহীহ বুখারী হা : ১০।

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

'আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখান না।'[৯৪]

২. ফাসিকরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়, বরং মুনাফিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক।"[৯৫]

৩. ফাসিকরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, তারা কখনো আল্লাহর প্রিয় হতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিকদের ভালোবাসেন না।'[৯৬]

৪. ফাসিকদের দু'আ কবুল হয় না; কবুল করা হয় শুধু মুত্তাক্বীদের দুআ। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

'নিশ্চয়ই, আল্লাহ শুধু মুত্তাক্বীদের দু'আ কবুল করেন।'[৯৭]

৫. ফাসিকদের জন্য আল্লাহর অভিশাপ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾

'অতএব, তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।'[৯৮]

৬. ফাসিকদের জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

'পরনিন্দাকারী (গীবতকারী) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[৯৯] আর পরনিন্দা করা ফাসিকদের কাজ।

৭. ফাসিকদেরকে কবরের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিনে অপমানিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

'সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? তাহলে এখন তোমরা কুফরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।"[১০০]

৮. ফাসিকরা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

'আর যারা ফাসিক, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের আবার তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন কর, যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে।'[১০১]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে প্রতিয়মান হয় যে, ফাসিক ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী, সত্য গোপনকারী, মিথ্যাচারী ও সমাজে ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ-আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন, তাদের পথভ্রষ্ট করেন, এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।

আমাদের উচিত নিজেদের আমল যাচাই করা এবং যে কোনো ধরনের ফাসিকী থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন গঠন করা, সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থাকা এবং বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও সঠিক পথে রত থাকা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফাসিকী থেকে রক্ষা করুন এবং সৎ পথে চলার তাওফীক দিন, আমীন।❑❑

[৯৪] সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ১০৮।
[৯৫] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৬৭।
[৯৬] সূরা আস-সফ আয়াত : ৩।
[৯৭] সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ২৭।
[৯৮] সুরা আল-মায়িদা আয়াত : ১৩।
[৯৯] সহীহ মুসলিম হা : ১০৫।
[১০০] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৬।
[১০১] সূরা আস-সাজদা আয়াত : ২০।

যিকির নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা

সাইদুর রহমান*

মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে না যায় এজন্য তিনি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দু'আ এবং যিকিরের ব্যবস্থা করেছেন। খাওয়া দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, ঘরে প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়ার সময় দু'আ, টয়লেটে যাওয়ার সময় দু'আ এবং বের হওয়ার সময় দু'আ, মসজিদে যাওয়ার সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ, নতুন কাপড় পরিধান করার সময় দু'আ। এমনকি সহবাসের সময় যেন বান্দা আল্লাহকে ভুলে না যায় এজন্য তিনি ওই সময়েও তাকে স্মরণ করার জন্য দু'আর ব্যবস্থা রেখেছেন। মোটকথা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যিকির ও দু'আ রয়েছে।

যিকির অর্থ কী?

যিকির অর্থ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় করো, আমার সাথে কুফরী করো না।[১০২]

যিকির দুই প্রকার :

১. মুতলাক তথা সাধারণ যিকির

২. মুকাইয়াদ তথা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যিকির। মুতলাক তথা সাধারণ যিকির হচ্ছে, সব সময় কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা তাসবীহ তাহলীল করা, নবী ﷺ এর ওপর দরূদ পাঠ করা, আল্লাহু আকবার বলা, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি প্রভৃতি যিকির করা। মুতলাক তথা সাধারণ যিকির এবং মুকাইয়াদ তথা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যিকির যদি একত্রিত হয় এই ক্ষেত্রে মুকাইয়াদ যিকির প্রাধান্য পায়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই। ধরুন আপনি কুরআন তেলাওয়াত করছেন। এই সময় মসজিদে আজান দিচ্ছে। এখন আপনি কি করবেন? কুরআন পড়বেন নাকি আজানের উত্তর দিবেন? এই মুহূর্তে আপনি আযানের উত্তর দিবেন। কারণ আজানের উত্তর দেয়া এটা মুকাইয়াদ যিকির তথা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর কুরআন তেলাওয়াত করা এটা মুতলাক যিকির। তাই এই ক্ষেত্রে মুকাইয়াদ যিকির প্রাধান্য পাবে। ধরুন আপনি সুবহানাল্লাহ পড়ছেন। এই মুহূর্তে আপনার সামনে কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে। এখন আপনি কী সুবহানাল্লাহ পড়তে থাকবেন নাকি হাঁচির উত্তর দিবেন? এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি হাঁচির উত্তর দিবেন। কারণ হাঁচির উত্তর দেয়া এটা মুকাইয়াদ যিকির আর সুবাহানাল্লাহ পড়া এটা মুতলাক যিকির। তাই এই ক্ষেত্রে মুকাইয়াদ যিকির প্রাধান্য পাবে। আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিকির করছেন, এই মুহূর্তে একজন আপনাকে সালাম দিয়েছে। এখন আপনি কী করবেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির করবেন নাকি সালামের উত্তর দিবেন? অবশ্যই সালামের উত্তর দিবেন। কারণ এটা মুকাইয়াদ যিকির। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

যিকির আবার দুই প্রকার :

১. যিকিরে তাম তথা পরিপূর্ণ যিকির।

২. যিকিরে নাকেস তথা ত্রুটিপূর্ণ যিকির।

যিকিরে তাম তথা পরিপূর্ণ যিকির হচ্ছে ওই যিকির, যে যিকির করার সময় অন্তর এবং মুখ একসাথে একত্রিত থাকে। তথা অন্তর উদাসীন থাকে না। আর যিকিরে নাকেস তথা ত্রুটিপূর্ণ জিকির হচ্ছে ওই যিকির, যে যিকির করার সময় অন্তর উদাসীন থাকে। তথা শুধু মুখ দ্বারা যিকির হয়ে থাকে। যিকিরে তাম-এর ফযীলত বেশি। আর যিকিরে নাকেস-এর ফযীলত কম। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যিকিরে তাম তথা পরিপূর্ণ যিকির করার।

যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ কয় ভাবে করা যায়?

যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ তিনভাবে করা হয়ে থাকে।

১. মুখ দ্বারা। যেমন নবী ﷺ বলেন,

" أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ "

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" অতি উত্তম যিকির এবং "আলাহামদু লিল্লাহ্" অধিক উত্তম দু'আ।[১০৩]

২. অন্তর দ্বারা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১০২] সূরা বাকারা আয়াত : ১৫২।

[১০৩] তিরমিযী হা : ৩৩৮৩।

ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।[১০৪]

৩. অঙ্গ প্রতঙ্গের দ্বারা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সলাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।[১০৫]

ওপরে বর্ণিত তিনটি অঙ্গ দ্বারা যিকির করা যায়।

যিকির করার সময় যদি মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই তিনটি জিনিস একত্রিত হয় তাহলে এটা সবচেয়ে উত্তম যিকির। কারণ এখানে যিকির করার তিনটি অঙ্গই একত্রিত হয়েছে।

অন্তরের যিকির হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। মুখের যিকির হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা এগুলো পাঠ করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিকির হচ্ছে রুকু করা, সাজদা করা ইত্যাদি। এই তিনটি অঙ্গের যিকিরের মাঝে সবচেয়ে উত্তম যিকির হচ্ছে অন্তর দ্বারা যিকির করা। কারণ আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।[১০৬]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুখের কথা বলেননি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলেননি। বরং অন্তরের কথা বলেছেন।

যিকির কি সব সময় করা যায়?

যিকির পবিত্র ও অপবিত্র সর্বাবস্থায় করা যায়। তবে ফরজ গোসল অবস্থায় শুধু কুরআন তেলাওয়াত করবে না। তবে নারীরা ঋতুবর্তী অবস্থায় কুরআন পড়তে পারবে।[১০৭]

যিকির মানুষের অন্তরকে জীবিত ও চাঙ্গা করে তোলে, যেভাবে পানি গাছকে জীবিত করে তোলে। যে অন্তরে যিকির নেই, যে অন্তর যিকির করে না, সে অন্তর মারা গেছে। সে অন্তর কালিমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অন্তরকে চির সজীব ও প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য সর্বদা যিকির করা উচিত।[১০৮]

যিকির কিভাবে করবেন?

মাঝেমধ্যে আমরা গণমাধ্যমের কল্যাণে দেখতে পাই অনেক মানুষ লাফিয়ে লাফিয়ে, উচ্চস্বরে যিকির করে। এভাবে যিকির করা যাবে না। এগুলো করলে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। কারণ উচ্চস্বরে লাফিয়ে যিকির করতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১০৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

আবু মূসা আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা যখন উঁচু স্থানে উঠতাম, তখন উচ্চস্বরে "আল্লাহু আকবার" বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন : "হে মানুষ! নিজেদের ওপর সহজ করো (অর্থাৎ আওয়াজ কমাও)। তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সাথে আছেন; তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।"[১১০]

সুতরাং আপনি যদি দেখতে পান কিছু মানুষ এভাবে যিকির করে তাহলে বুঝতে হবে তারা বিদ'আতী। তারা কোনো পীরের তরিকায় মুরিদ হয়েছে। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক পথের ওপর রাখুন আমীন।❑❑

[১০৪] সূরা কাহফ আয়াত : ২৮।
[১০৫] সূরা জুমা আয়াত : ৯।
[১০৬] সূরা কাহফ আয়াত : ২৮।
[১০৭] ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম, হা : ৭২, ১/২৭৪
[১০৮] ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম, হা : ৭২, ১/২৭৪।
[১০৯] সূরা আল-আরাফ আয়াত : ২০৫।
[১১০] সহীহ বুখারী হা : ২৯৯২।

সূচিপত্র

শুব্বানে পাতা | صفحات الشبان

ফুটবল বিশ্বকাপ আগ্রাসী শক্তির আবির্ভাব

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

পৃথিবী মানব সভ্যতার ইতিহাসে ফুটবল খেলা বিনোদনের নাম নয়; প্রতিটি যুগে শক্তিশালী জাতি ও সাম্রাজ্য খেলাকে ব্যবহার করেছে নিজেদের ক্ষমতা, সংস্কৃতি ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে। আধুনিক যুগে সেই বাস্তবতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ফুটবল বিশ্বকাপ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আবেগ, উন্মাদনা ও মনোযোগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আয়োজন আজ কেবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; এটি অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং বৈশ্বিক আধিপত্যের এক জটিল মঞ্চ। বিশ্বকাপের সবুজ মাঠে খেলোয়াড়রা দৌড়ালেও এর পেছনে সক্রিয় থাকে রাষ্ট্রশক্তি, কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক মিডিয়াবাদ এবং কূটনৈতিক স্বার্থপরতা। ফলে ফুটবল বিশ্বকাপকে অনেক চিন্তাবিদ 'আধুনিক বিশ্বের নরম আগ্রাসনের উৎসব' বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

ফুটবল খেলা ও বর্তমান বিশ্বকাপ : বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত খেলা হলো ফুটবল। এক সময়কার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বিনোদন ছিল এই খেলা। ধীরে ধীরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে এই খেলা আগ্রাসনবাদে রূপ নিয়েছে। ইসলাম মানুষের দেহ ও আত্মা-উভয়ের সুস্থতা ও শক্তির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তাই শরীরচর্চা, উপকারী খেলাধুলা ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জন ইসলামে উৎসাহিত বিষয়। ফুটবল যদি শালীনতা, নৈতিকতা ও ইবাদতের সীমারেখা বজায় রেখে খেলা হয়, তবে তা বৈধ বিনোদন ও উপকারী শরীরচর্চার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখযোগ্য-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ...

'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে''[১১১]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলাম দুর্বলতা নয়; বরং শক্তি, কর্মক্ষমতা ও সুস্থতাকে পছন্দ করে। ফুটবল মানুষের শরীরকে শক্তিশালী করে, দলীয় শৃঙ্খলা শেখায়, ধৈর্য ও নেতৃত্বের গুণ তৈরি করে। তবে খেলাধুলা এমন পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত নয়, যা মানুষকে সলাত, ইবাদত, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে ফুটবল নিজে নিষিদ্ধ নয়; বরং তা তখনই প্রশংসনীয়, যখন তা স্বাস্থ্য, ভ্রাতৃত্ব ও বৈধ আনন্দের মাধ্যম হয় এবং গুনাহ, অশ্লীলতা ও অন্ধ উন্মাদনা থেকে মুক্ত থাকে।

বর্তমান বিশ্বকাপ পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসরগুলোর একটি। এটি শুধু ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়; বরং বিশ্বব্যাপী আবেগ, বিনোদন, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের এক মহামিলন। আধুনিক প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও কর্পোরেট শক্তির কারণে বিশ্বকাপ আজ বৈশ্বিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ আয়োজন মানুষের মাঝে আনন্দ, ঐক্য ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করলেও অতিরিক্ত উন্মাদনা, সময় অপচয় ও অন্ধ সমর্থনের মতো নেতিবাচক দিকও রয়েছে। তাই খেলাধুলা উপভোগের পাশাপাশি দায়িত্ববোধ ও নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

আগ্রাসন শক্তিতে ফুটবল বিশ্বকাপ : বর্তমান যুগে বিশ্বকাপকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি জগতের বিশাল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্টেডিয়ামের ঝলমলে আয়োজন, কোটি দর্শকের সরাসরি সম্প্রচার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারণা বিশ্বকাপকে বৈশ্বিক উৎসবে পরিণত করেছে।

---

* মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[১১১] সহীহ মুসলিম হা : ২৬৬৪।

কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অতিরিক্ত উন্মাদনা, অন্ধ দলীয় সমর্থন, সময় অপচয় ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় খেলাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে মানুষ বাস্তব দায়িত্ব ও নৈতিক চেতনা থেকে দূরে সরে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থ, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে।"[১১২]

পিয়ের বুর্দিয়ে তাঁর Distinction গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে সংস্কৃতি, বিনোদন ও মানুষের পছন্দ-অপছন্দ শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে সমাজে ক্ষমতা, প্রভাব ও শ্রেণিগত আধিপত্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও খেলাধুলাও অনেক সময় শক্তিশালী গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।[১১৩]

নোম চমস্কি ও এডওয়ার্ড এস. হারম্যান তাঁদের Manufacturing Consent গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে, শক্তিশালী গণমাধ্যম অনেক সময় জনমত নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের চিন্তাকে নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করে। বৃহৎ ক্রীড়া আসরগুলোও মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক আবেগ ও মনোযোগ তৈরির ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[১১৪]

এরিক হবসবম তাঁর Nations and Nationalism since ১৭৮০ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক খেলাধুলা বহু সময় জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রকাশের প্রতীকে পরিণত হয়।[১১৫]

১) জীবনের সময় অপচয় : বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে মানুষ অসংখ্য ঘণ্টা খেলা দেখা, আলোচনা ও সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করে। ফলে শিক্ষা, গবেষণা, ইবাদত ও আত্মউন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সময় হারিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 'সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।'[১১৬]

রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত হাদীস,

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত-সুস্থতা ও অবসর সময়।'[১১৭]

হাসান আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

"يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ"

'হে আদম সন্তান! তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি। তোমার একটি দিন চলে গেলে তোমার একটি অংশ চলে গেল।'[১১৮]

নীল পোস্টম্যান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Amusing Ourselves to Death-এ দেখিয়েছেন যে, আধুনিক সমাজ অতিরিক্ত বিনোদননির্ভর হয়ে পড়লে গভীর চিন্তা, জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ দুর্বল হয়ে যায়।[১১৯]

অর্থনীতিবিদ সোফিয়া ইজকিয়েৰ্দো সানচেজ, ক্যারোলিন এলিয়ট এবং রবার্ট সিমন্স তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে বড় আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট মানুষের অবসর সময়ের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ফুটবল ম্যাচের সময় মানুষ অন্যান্য গঠনমূলক কর্মকাণ্ড-যেমন পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সামাজিক অংশগ্রহণ বা বিকল্প অবসরচর্চা-কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘ সময় খেলা দেখায় ব্যয় করে। গবেষণাটি ফুটবল দর্শনের কারণে মানুষের সময় বণ্টনের পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছে।[১২০]

---

[১১২] সূরা আত-তাকাসুর আয়াত : ০১।

[১১৩] পিয়ের বুর্দিয়ে, ডিস্টিংশন: এ সোশ্যাল ক্রিটিক অব দ্য জাজমেন্ট অব টেস্ট, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৬-৭।]

[১১৪] নোয়াম চমস্কি ও এডওয়ার্ড এস. হারম্যান, ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব দ্য মাস মিডিয়া, প্যানথিয়ন বুকস, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১-২।

[১১৫] এরিক হবসবম, নেশনস অ্যান্ড ন্যাশনালিজম সিন্স ১৭৮০, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৫।

[১১৬] সূরা আল-আসর আয়াত : ১-২।

[১১৭] সহী বুখারী হা : ৬৪১২।

[১১৮] আবু নু'আইম আল-ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) খণ্ড-২, দারুল হাদীস, মিসর, পৃ. ১৪৮।

[১১৯] নীল পোস্টম্যান, অ্যামিউজিং আওয়ারসেলভস টু ডেথ, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬

[১২০] সোফিয়া ইজকিয়েৰ্দো সানচেজ, ক্যারোলিন এলিয়ট ও রবার্ট সিমন্স, "দ্য সাবস্টিটিউশন বিটুইন লেজার অ্যাক্টিভিটিজ: এ কোয়াসি-ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্ট ইউজিং স্পোর্টস ভিউয়িং অ্যান্ড সিনেমা অ্যাটেনডেন্স", অ্যাপ্লাইড ইকোনমিকস (Applied Economics),খণ্ড-৪৮,

ক্রীড়া সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল এল. ওয়ান এবং তাঁর সহগবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, অনেক মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় ও আবেগের একটি বড় অংশ তাদের সমর্থিত দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে জয়-পরাজয়, দলীয় আনুগত্য ও ক্রীড়া-আবেগ ব্যক্তির আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।

কোনো দল বা খেলোয়াড়ের পক্ষপাতিত্ব করায় আগ্রাসী শক্তি হয়ে পড়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধে (বনু মুসতালিক) উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন মুহাজির এক আনসারীকে আঘাত করলেন। এতে আনসারী ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! (তোমরা আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো)।' আর মুহাজির ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! (তোমরা আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো)।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনতে পেয়ে বললেন: 'তোমরা এই (অন্ধ পক্ষপাতিত্বের) ডাক ত্যাগ করো, কেননা এটি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও নিকৃষ্ট।'[১২১]

২) অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রসার : ফুটবল খেলার বর্তমান স্বরূপটি মানুষের নৈতিক চরিত্র ও শরিয়তের বিধানকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করছে। এর অন্যতম প্রধান দিক হলো পোশাকের উগ্রতা ও সতর উন্মুক্তকরণ। ইসলামে পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ঢেকে রাখা ফরজ, যা অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ আধুনিক ফুটবলে খেলোয়াড়েরা যে হাফপ্যান্ট পরিধান করে, তা হাঁটু এবং উরুর বড় অংশকে উন্মুক্ত করে দেয়। এই সতর না ঢেকে খেলাধুলা করা এবং কোটি কোটি দর্শকের তা দেখা স্পষ্ট গুনাহের কাজ। ফুটবল খেলায় যদি উরু বা হাঁটুর ওপরের অংশ প্রকাশ পায়, তবে তা খেলা এবং দেখা উভয়ই হারাম।[১২২]

একইভাবে ইমাম কাসানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, পুরুষের উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা বা দেখা বৈধ নয়।[১২৩]

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড রাউই বলেছেন, আধুনিক ক্রীড়া সম্প্রচারগুলো কেবল খেলা দেখায় না, বরং দর্শক ধরে রাখার জন্য গ্যালারির গ্ল্যামার, লৈঙ্গিক সুড়সুড়ি এবং অবাস্তব দৈহিক আকর্ষণকে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলে, যা তরুণ সমাজের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় তৈরি করে। এ মিডিয়া সংস্কৃতির কারণে যুবসমাজ খেলার মূল স্পিরিট ভুলে গিয়ে উশৃঙ্খল জীবনযাপনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে।[১২৪]

তরুণ সমাজের ওপর খেলাধুলা ও মিডিয়া তারকাদের অন্ধ অনুকরণের প্রভাব পরিমাপ করতে গিয়ে ক্রীড়া সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, বর্তমান প্রজন্মের একটি বিশাল অংশ তাদের প্রিয় তারকাদের লাইফস্টাইল দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

২০১৭ সালে "Journal of Sport and Social Issues" জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি পরিচালনা করেছিলেন যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) সমাজবিজ্ঞানী ও ক্রীড়া গবেষক প্রফেসর ড. রিচার্ড গিউলিয়ানোত্তি (Richard Giulianotti) এবং তাঁর সহযোগী গবেষক দলগত একটি একাডেমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ফুটবল অনুরাগী তরুণদের প্রায় ৬৫% থেকে ৭০% শতাংশই তাদের প্রিয় খেলোয়াড়ের চুল কাটার স্টাইল, ফ্যাশন, পোশাক এবং বাহ্যিক আচরণ হুবহু অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এই অনুকরণের প্রবণতা তরুণদের নিজস্ব ধর্মীয় ও পারিবারিক

সংখ্যা ৪০, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩৮৪৮-৪৯।

[১২১] সহীহ বুখারী হা : ৪৯০৫; সহীহ মুসলিম হা : ২৫৮৪।

[১২২] ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দাইমাহ, সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড), খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ২৩৮।

[১২৩] বাদায়িউস সানায়িউ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১২৩

[১২৪] [Sport and Social Theory (স্পোর্ট অ্যান্ড সোশ্যাল থিওরি), পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫]

মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে পশ্চিমা উচ্ছৃঙ্খল সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করে।[১২৫]

যেমনটি হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে (তাদের সংস্কৃতি, উগ্র ফ্যাশন বা জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণ করবে), সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"[১২৬]

তরুণ সমাজ যখন তাদের দ্বীনদার আইডলদের বাদ দিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান বা অমুসলিম ফুটবল তারকাদের অন্ধ অনুকরণ করে, তখন এই হাদিসের আলোকেই তা নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

৩) সংস্কৃতির আগ্রাসন : ফুটবল এবং আধুনিক মিডিয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে যে 'সংস্কৃতির আগ্রাসন' (Cultural Imperialism) ঘটছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির এই অন্ধ অনুকরণ মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয় ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ। ইসলামে অমুসলিমদের ধর্মীয় বা উচ্ছৃঙ্খল সংস্কৃতির সাদৃশ্য গ্রহণ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন যে, কাফেরদের বাহ্যিক পোশাক, ফ্যাশন বা চালচলনের অনুকরণ মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা ও মানসিক দাসত্ব তৈরি করে, যা ক্রমান্বয়ে মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।[১২৭]

ফুটবল তারকাদের জীবনযাত্রাকে আদর্শ বানানোর কারণে মুসলিম যুবসমাজের বড় অংশ আজ এই মানসিক দাসত্বের শিকার। বিশেষ করে খেলোয়াড়দের অনুকরণে চুলে যে উগ্র বা অদ্ভুত ছাঁট তরুণরা দিচ্ছে, তা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রাহিঃ) বলেছেন, 'মাথার কিছু অংশের চুল চেঁছে ফেলা এবং কিছু অংশের চুল লম্বা বা বড় রাখা (যাকে কাযা বলা হয়) শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহে তাহরীমি এবং এটি মুসলমানদের ঐতিহ্য পরিপন্থী একটি অনৈসলামিক ফ্যাশন।'[১২৮]

একইভাবে শরীরে উল্কি বা ট্যাটু আঁকার যে পশ্চিমা সংস্কৃতি ফুটবলারদের মাধ্যমে যুবসমাজে মহামারি আকারে ছড়িয়েছে, এই ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান হলো, 'দেহে সুঁই ফুটিয়ে রঙ বা উল্কি আঁকা স্পষ্ট কবিরা গুনাহ এবং এটি আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটানোর শামিল, যার কারণে মানুষের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ নেমে আসে।'[১২৯]

ধর্মীয় এ নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাতেও এই আগ্রাসনকে মানবসভ্যতার জন্য একটি বড় সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমকালীন সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, 'প্রভাবশালী বা পশ্চিমা বিশ্ব কর্পোরেট মিডিয়া ও গ্লোবাল সেলিব্রেটিদের ব্যবহার করে অনুন্নত বা মুসলিম দেশগুলোর মানুষের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য তৈরি করে। এর ফলে অবক্ষয়গ্রস্ত তরুণ সমাজ নিজেদের ঐতিহ্যকে হীন মনে করে এবং পশ্চিমা তারকাদের উচ্ছৃঙ্খল সংস্কৃতিকে আধুনিকতা বা আভিজাত্যের প্রতীক ভেবে অন্ধভাবে গ্রহণ করে।'[১৩০]

এই আগ্রাসন মূলত মানুষের মগজ ও চিন্তাধারাকে পরাধীন করার একটি পরিকল্পিত ফাঁদ। যেমনটি উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের বিখ্যাত তাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন, 'আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে ভূখণ্ড দখল করে না, বরং বিশ্বজনীন বিনোদন ও গ্লোবাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মগজ এবং চিন্তাশক্তিকে দখল করে।'[১৩১]

ফুটবল আজ সেই কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদেরই সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক হাতিয়ার, যা বিশ্বায়নের নামে তরুণদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বাতন্ত্র ও নৈতিক চরিত্রকে সম্পূর্ণ মুছে দিচ্ছে।

---

[১২৫] [Journal of Sport and Social Issues (জার্নাল অফ স্পোর্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুজ), খণ্ড: ৪১, পৃষ্ঠা: ২১১।

[১২৬] সুনানে আবু দাউদ হা : ৪০৩১ (আলবানী (রাহি.) কর্তৃক সহীহ নিয়োজিত।

[১২৭] ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা : ৩১৪।

[১২৮] ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), শারহু সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১০১।

[১২৯] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ফাতহুল বারী, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩৭৭

[১৩০] পিয়েরে বোর্দিউ, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, পৃষ্ঠা: ১৭২]

[১৩১] এডওয়ার্ড সাঈদ, Culture and Imperialism, পৃষ্ঠা: ৫২

৪) মানবতার সংকট : ফুটবল এবং আধুনিক ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্মাদনায় বিশ্বজুড়ে এক গভীর 'মানবতার সংকট' (Humanitarian Crisis) তৈরি করছে। ক্যানভাসের পর ক্যানভাস জুড়ে আজ সভ্যতার যে অবক্ষয়, তার অন্যতম প্রধান অনুঘটক হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক ফুটবলের কৃত্রিম গোলপোস্ট। বিনোদনের যে সবুজ ঘাস মানুষকে সতেজ করার কথা ছিল, কর্পোরেট বাণিজ্য আর উগ্র অন্ধ-আবেগের করাল গ্রাসে তা আজ মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মানবিক মূল্যবোধের এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। মানুষ আজ খেলার মাঠের সস্তা জয়-পরাজয়ের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করছে মানুষের রক্তের মূল্য। অথচ মানবপ্রাণের পবিত্রতা ও অপরিসীম গুরুত্ব ঘোষণা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।'[১৩২]

এই সংকট কেবল ফিজিক্যাল স্টেডিয়ামের মারামারিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর চেয়েও সূক্ষ্ম ও বিষাক্ত এক মানসিক নির্যাতন প্রতিদিন নিঃশব্দে ঘটে চলেছে ভার্চুয়াল দুনিয়ার অলিতে-গলিতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আজ পরিণত হয়েছে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, উপহাস, ট্রল আর সাইবার বুলিং-এর এক নোংরা আঁস্তাকুড়ে। প্রতিপক্ষ দলের পরাজয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তামাশা করা, মা-বোনকে জড়িয়ে কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় ট্রল করা আজ তরুণদের নিত্যদিনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এই মানসিক বিকৃতি ও শব্দ-সন্ত্রাস মানুষের ভেতরের দয়া ও সহমর্মিতার শেষ বিন্দুটিকেও শুষে নিচ্ছে। মানুষের আত্মসম্মানকে এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার এই পাপাচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে।'[১৩৩]

এই গভীর সত্যটি উন্মোচন করতে গিয়ে সমকালীন ক্রীড়া সমাজবিজ্ঞানী তাঁর তাত্ত্বিক লেখনীতে উল্লেখ করেছেন :

'আধুনিক ফুটবল সংস্কৃতির বাণিজ্যিক হাইপ মানুষের ভেতর এক ধরনের উগ্র উপজাতীয় মানসিকতা (Tribalism) তৈরি করে। এটি মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক সহানুভূতিকে অবরুদ্ধ করে দেয় এবং প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের মানুষ হিসেবে দেখার পরিবর্তে একটি চিরশত্রু সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতে শেখায়।'[১৩৪]

সবুজ মাঠের এ কৃত্রিম আলো মূলত তরুণ সমাজের আত্মিক অন্ধকারকে আড়াল করার এক মায়াজাল। ফুটবল সংস্কৃতির এ উগ্র আগ্রাসন মানুষের চিরন্তন ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক ক্ষমা, শ্রদ্ধা এবং দয়ার মতো গুণগুলোকে সমাজ থেকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বিনোদনের এই আধুনিক আফিম বর্তমান প্রজন্মকে এক আত্মঘাতী এবং গভীর মানবিক সংকটের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করছে। এই উন্মাদনার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে হতাহতের যে পরিসংখ্যান, তা সত্যিই অত্যন্ত মর্মান্তিক। খেলাধুলার এ কৃত্রিম কর্পোরেট হাইপ কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন প্রদীপ কেড়ে নিচ্ছে, তা সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিসংখ্যান এবং খবরের আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বমঞ্চের দিকে তাকালে দেখা যায়, ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানবতার সংকটগুলো তৈরি হয়েছে স্টেডিয়ামের ভেতরেই। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক দশকে কেবল স্টেডিয়ামের উগ্রতা, দাঙ্গা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে

[১৩২] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৯৩।

[১৩৩] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১১।

[১৩৪] রিচার্ড গিউলিয়ানোত্তি, Football: A Sociology of the Global Game, পৃষ্ঠা: ৪৫

বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালে পেরু এবং আর্জেন্টিনার ম্যাচকে কেন্দ্র করে লিমা স্টেডিয়ামের দাঙ্গায় ৩২৮ জন নিহত এবং ৫০০ জনের বেশি আহত হন, যা ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ ট্র্যাজেডি। এর সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় বিবিসি স্পোর্টস হিস্ট্রি আর্কাইভে।[১৩৫] ১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্যের হিলসবরো স্টেডিয়ামের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৯৭ জন লিভারপুল সমর্থক প্রাণ হারান, যা ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সের তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।[১৩৬]

২০০১ সালের ৯ মে ঘানার আকরা স্পোর্টস স্টেডিয়ামে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের সমর্থকদের উগ্র আচরণ এবং পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের পর হুড়োহুড়িতে পিষ্ট হয়ে ১২৬ জন ফুটবলপ্রেমী মারা যান।[১৩৭]

২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিসরের পোর্ট সাইদ স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে আল-মাসরি ও আল-আহলি ক্লাবের সমর্থকেরা মাঠে নেমে একে অপরের ওপর ছুরি ও পাথর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ৭৪ জন মানুষ নির্মমভাবে খুন হন এবং সহস্রাধিক আহত হন।[১৩৮]

আর সাম্প্রতিককালের অন্যতম বড় ধাক্কাটি আসে ২০২২ সালের অক্টোবরে, যখন ইন্দোনেশিয়ার কাঞ্জুরুহান স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ শেষে সমর্থকদের উগ্রতা ও পুলিশের টিয়ার গ্যাসের কারণে সৃষ্ট হুড়োহুড়িতে অন্তত ১৩৫ জন মানুষ নিহত হন, যাদের মধ্যে বহু শিশু ও তরুণ ছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই ঘটনার ওপর একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১৩৯] ফুটবলকে কেন্দ্র করে এই বৈশ্বিক দাঙ্গা ও হতাহতের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, বিনোদনের এই উগ্রতা মানুষকে কতটা নৃশংস করে তুলতে পারে।

অন্য দিকে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটি আরো বেশি বেদনাদায়ক ও বিচিত্র। এখানে হতাহতের ঘটনাগুলো স্টেডিয়ামের ভেতরে নয়, বরং হাজার মাইল দূরের লাতিন অমেরিকার দুটি দেশ-ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থনকে কেন্দ্র করে ঘরের মাঠে এবং রাজপথে ঘটে। দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিক এবং বিভিন্ন বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনের সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতি চার বছর পর পর যখন ফুটবল বিশ্বকাপ আসে, তখন বাংলাদেশে উগ্র উন্মাদনার কারণে কয়েক ডজন মানুষের মৃত্যু এবং সহস্রাধিক মানুষ গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই উদ্বেগজনক হতাহতের ঘটনাগুলো প্রধানত ঘটে থাকে পারস্পরিক সংঘাত ও সহিংসতা, ছাদ থেকে পড়ে এবং বিদ্যুতায়িত হয়ে দুর্ঘটনার কারণে। কেবল কোন দল শ্রেষ্ঠ বা কোন দলের খেলোয়াড় ভালো- এই তুচ্ছ তর্ককে কেন্দ্র করে সমর্থকেরা লাঠি, রামদা এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয়। এতে অনেক তরুণকে নিজের ভাই বা বন্ধুর আঘাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। যেমনটি দৈনিক ইত্তেফাকের একটি মর্মান্তিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, যেখানে খেলা দেখা নিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে ছুরি ও লাঠিসোটা নিয়ে হামলা হয়, যাতে একজন নিহত এবং অন্তত ৫ জন গুরুতর জখম হন।[১৪০]

একইভাবে প্রিয় দলের বিশাল আকৃতির পতাকা টাঙাতে গিয়ে বহুতল ভবনের ছাদ বা বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পিছলে পড়ে প্রতি বিশ্বকাপেই অনেক কিশোর ও তরুণের অকাল মৃত্যু ঘটে। দ্য ডেইলি স্টার (বাংলা)-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জে আর্জেন্টিনা দলের তিন তলা সমান বিশাল পতাকা ভবনের ছাদে বাঁধতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে এক কিশোর ফুটবল ভক্তের মৃত্যু হয়।[১৪১]

---

[135] BBC Sport History Archive, "The world's worst stadium disasters - Lima 1964", Published: May 2014

[136] The Hillsborough Independent Panel Report, House of Commons, United Kingdom, Published: September 2012

[137] The Guardian, "Accra Football Stadium Disaster Report", 2001

[138] CNN International, "The Port Said Stadium Massacre", 2012

[139] Human Rights Watch (HRW) Report, "Indonesia: Soccer Stadium Stampede Fatalities and Police Accountability", Published: October 2022

[১৪০] দৈনিক ইত্তেফাক, শিরোনাম : 'বাগেরহাটে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সংঘর্ষ, যুবক নিহত", প্রকাশকাল : ১০ ডিসেম্বর ২০২২।

[১৪১] The Daily Star (বাংলা), শিরোনাম: 'নারায়ণগঞ্জে আর্জেন্টিনার

আবার কাঁচা বাঁশে বা লোহার রডে পতাকা বেঁধে তা ভবনের ওপরের হাই-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারের পাশ দিয়ে ওড়াতে গিয়ে শট সার্কিটের মাধ্যমে আগুনে পুড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বহু সমর্থক ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অনেকে চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন। দৈনিক প্রথম আলোর একটি সংবাদে দেখা যায়, সাভারে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার পতাকা টানানোর সময় বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে একই সাথে দুই তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।[১৪২]

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক কিশোর ছিল আর্জেন্টিনার কট্টর সমর্থক। সৌদি আরবের সাথে আর্জেন্টিনার অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর তার বন্ধু মহলের তীব্র ট্রল, উপহাস ও মানসিক নির্যাতন সে সহ্য করতে পারেনি। বন্ধুদের কটুক্তিতে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে সেই ১৬ বছরের কিশোরটি ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং একপর্যায়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবনের ইতি টানে। খেলাধুলার সস্তা ট্রল যে একটা মানুষের আত্মহত্যার কারণ হতে পারে, এই ঘটনাটি তার এক জ্বলন্ত ক্ষত।[১৪৩]

নরসিংদীর রায়পুরায় খেলা দেখা এবং প্রিয় খেলোয়াড় মেসি ও নেইমারের তুলনা করা নিয়ে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধে। ঝগড়াটি একপর্যায়ে পারিবারিক দাঙ্গায় রূপ নেয় এবং দুই ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে দুই দলের সমর্থক গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা ও টেঁটা (দেশীয় অস্ত্র) নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর এবং দুই ভাইসহ প্রায় ১০ জন গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন কাটায়।[১৪৪]

আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর গভীর রাতে সারা দেশের মতো মাগুরা এবং চুয়াডাঙ্গাতেও তরুণরা উন্মত্ত বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। ৩-৪ জন তরুণ মিলে একেকটি মোটরসাইকেলে হেলমেট ছাড়া অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে চিৎকার করতে করতে হাইওয়েতে রেস লাগায়। একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশের একটি কালভার্ট ও গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে দুই তরুণের মগজ বেরিয়ে যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরো একজনের মৃত্যু হয়। বিজয়ের আনন্দ মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সেই পরিবারগুলোর জন্য চিরস্থায়ী কান্নার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৪৫]

এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের আর্কাইভ এবং মানবাধিকার প্রতিবেদনগুলোই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, এই তথাকথিত ফুটবল উন্মাদনা কীভাবে বাস্তব জীবনে এক ভয়াবহ রক্তাক্ত ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয় এবং সুস্থ সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে এক চরম আত্মঘাতী ও অমানবিক সংকটে পরিণত হয়। ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উগ্র অন্ধ-আসক্তি আজ বিনোদনের পরিধি ছাড়িয়ে এক আগ্রাসী সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। হাজার মাইল দূরের কোনো দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমাদের সমাজে ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙানো হয় কিংবা সস্তা ট্রলের জেরে কোনো তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যায়, তখন ট্রফিটা হয়তো কোনো দেশ জেতে কিন্তু পরাজয় ঘটে খোদ মানবতার। তাই গোলপোস্টের এই কৃত্রিম মোহ কাটিয়ে আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জরুরি। ফুটবল যেন কেবল মাঠেরই একটি সাময়িক খেলা হয়ে থাকে; তা যেন কোনোভাবেই মানুষের জীবন, সামাজিক সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধকে গ্রাস করতে না পারে। চামড়ার বলের পেছনে অন্ধের মতো না ছুটে আমাদের মূল্যবান সময় ও চেতনাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার মাঝেই লুকিয়ে আছে আগামী প্রজন্মের প্রকৃত মুক্তি। তাই কবিতার ভাষায় বলতে হয়-

‘ফুটবল বিশ্বকাপে মানব জাতি হচ্ছে আগ্রাসনের আগুন

সংস্কৃতি ভুলে মুসমানদের চেতনার বিবেক হচ্ছে খুন।

আর কতকাল থাকবে খেলায় দলগত টানাটানি

তরুণ সমাজ উঠবে কবে এসব কিছু ছাড়ি।❑❑

পতাকা টানাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু’, প্রকাশকাল : ২৩ নভেম্বর ২০২২।

[১৪২] দৈনিক প্রথম আলো, শিরোনাম : ‘সাভারে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ২ তরুণের মৃত্যু’, প্রকাশকাল: ২০ নভেম্বর ২০২২

[১৪৩] ২৪ নভেম্বর, ২০২২, দৈনিক যুগান্তর ও স্থানীয় ক্রাইম রিপোর্টিং (সৌদি আরবের সাথে আর্জেন্টিনার ম্যাচের পরদিন এই ঘটনা ঘটে।

[১৪৪] ১১ ডিসেম্বর, ২০২২, দনিক ইনকিলাব ও দৈনিক ইত্তেফাক।

[১৪৫] ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২,The Daily Star, (১৮ ডিসেম্বর রাতে ফাইনাল ম্যাচ জয়ের পর গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং ১৯ ডিসেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়)

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নারীদের পোশাক সম্পর্কে জানতে চাই। তারা কেমন পোশাক পরিধান করে বাড়ি থেকে বের হবে, দয়া করে জানাবেন।

মাজহারুল ইসলাম, উত্তরা, ঢাকা

উত্তর : নারীরা যখন প্রয়োজনীয় কাজে বাড়ির বাইরে যাবে, তখন তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা হলো, তারা এমন পোশাক পরবে, যা দ্বারা মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সারা শরীর ঢেকে যায় এবং কাপড় এতটুকু মোটা হওয়া চাই, যাতে ওপর দিয়ে শরীর দেখা না যায়। বর্তমানে বাজারে যেসব বোরকা পাওয়া যায়, সেগুলো নারীদের জন্য খুবই মানানসই। তবে তাতে যেন বিভিন্ন রং-এর ডিজাইন না থাকে এবং সেটা যেন কালো রং-এর হয়। কেননা বর্তমানে এমন কিছু বোরকা বের হয়েছে যা পর্দার মাধ্যম না হয়ে ফিতনার কারণ হয়েছে। কিছু কিছু বোরকা এমন আছে, যাতে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে নারীরা কখনো পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করবে, ইসলামী শরীয়তে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

«أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ»

‘তিনি ঐসব মহিলাদের ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং তিনি ঐসব পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের আকৃতি ধারণ করে”।[১]

প্রশ্ন (২) নারীদের মুখমণ্ডলে চুল গজালে যেমন দাড়ি-মোছ গজালে করণীয় কী?

মফিজ উদ্দিন, টাঙ্গাইল

উত্তর : যদি এমন কোনো চুল গজায় যা দেখতে খারাপ লাগে, তাহলে তা তুলে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই, যেমন গোঁফ ও দাড়ি। বরং নারীদের যদি পুরুষদের মতো দাড়ি-মোচ গজায়, তাহলে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। তবে মুখের সাধারণ চুল উঠিয়ে ফেলা উচিত নয় এবং ভ্রুর চুলেও হাত দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি নারীদের মুখে কিংবা শরীরে এমন কিছু গজায়, যা দেখতে খারাপ বা কুৎসিত লাগে, তাহলে তা তুলে ফেলা উচিত এবং এতে কোনো ক্ষতি নেই, যেমন গোঁফ ও দাড়ি ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩) : বাড়ির ভিতরের মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীরা তাদের শরীরের কোন্ কোন্ অংশ প্রকাশ করতে পারবে?

মাহমুদ হাসান, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : আলেমগণ বলেছেন যে, একজন মহিলা অপরিচিত পুরুষদের সামনে নিজেকে আবৃত রাখতে হবে এবং তাদের থেকে তার সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখবে। তবে নিকটাত্মীয়দের বিশেষ করে মাহরামদের ক্ষেত্রে আলেমগণ বলেছেন যে, তাদের কাছে প্রথাগতভাবে যা অনাবৃত থাকে, যেমন মুখমণ্ডল, হাত ও পা, তা অনাবৃত করতে কোনো ক্ষতি নেই; এতে কোনো আপত্তি নেই। একইভাবে, মাথার চুল, বাহু এবং এই জাতীয় অঙ্গ অনাবৃত রাখা জায়েয আছে। কিন্তু ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সতর্ক থাকাই তার জন্য উত্তম। পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনা বা এ জাতীয় নিকটাত্মীয়দের কাছে এগুলো অনাবৃত করতে কোনো আপত্তি নেই। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এ ধরনের জিনিস দেখা একটি প্রচলিত রীতি, তাই এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে তার উচিত যথাসম্ভব সতর্ক থাকা, কারণ এ যুগে কিছু নিকটাত্মীয়কে বিশ্বাস করা যায় না এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে। অতএব সতর্কতা হিসেবে এবং যেকোনো সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য তার মুখমণ্ডল, হাত ও পা ছাড়া বাকি অংশ আবৃত রাখাই সর্বোত্তম ও উপযুক্ত।

প্রশ্ন (৪) মহিলাদের জন্য পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়া বৈধ? বৈধ হয়ে থাকলে এর জন্য কি কোনো শর্ত আছে? দয়া করে জানাবেন।

মখলেসুর রহমান, ঝিনাইদহ

[১] সুনান আবু দাউদ হা : ৪০৯৭।

উত্তর : যদি মহিলা ডাক্তার থাকেন, তবে আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক এবং সেক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি পুরুষ ডাক্তারের প্রয়োজন হয় এবং কোনো মহিলা ডাক্তার না থাকেন, তবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। প্রয়োজনে এটি জায়েয। তবে, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা নির্জনে করা উচিত নয়। যদি মাথা, হাত, পা ইত্যাদি দেখানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে তা একজন পুরুষ অভিভাবক (মাহরাম) বা তার স্বামীর উপস্থিতিতে দেখানো উচিত। আর যদি লজ্জাস্থানের সাথে জড়িত থাকে, তবে একজন মহিলা সঙ্গীর উপস্থিত থাকা উচিত। এটি আরো ভালো এবং অধিক সতর্কতামূলক অথবা অন্তত একজন নার্সের উপস্থিত থাকা উচিত। যদি একজন মহিলা নার্স থাকেন, তবে তা আরো উত্তম, অধিক সতর্কতামূলক এবং সন্দেহ থেকে আরো দূরে রাখে। আর নির্জনতার ব্যাপারে বলতে গেলে, তা কখনোই জায়েয নয়।

সুতরাং মহিলার স্বামী ও অভিভাবকদের এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং নারীদের এ বিষয়ে আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাদের অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং সকল পরিস্থিতিতে প্রলোভন ও সন্দেহের কারণগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু বিশেষ করে কোনো পুরুষ ডাক্তারের ক্ষেত্রে তিনি যতই সৎ, বিশ্বস্ত বা অন্য যেকোনো গুণের অধিকারী হোন না কেন, তার সাথে একা না থাকার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৫) : কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর আছে। এটা বলে পুরুষদেরকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য এমনটা আমরা দেখতে পাই না। তাহলে নারীরা কি হুর পাবে না?

আলতাফ হোসেন, খুলনা

উত্তর : জান্নাতে এমন কিছু রয়েছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মন কল্পনাও করেনি। এই পুরস্কার যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রতিশ্রুত। যদি কোনো নারী জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকেও এমন কিছু দান করবেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মন কল্পনাও করেনি। সেখানে সে তাই পাবে যা তার আত্মা কামনা করে, যেমন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর কিতাবে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন।

অতএব এই প্রশ্নগুলো অপ্রাসঙ্গিক। যখন একজন মুমিন পুরুষ ও নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা প্রত্যেকেই সেখানে তাই পাবে, যা তারা কামনা করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে নারীকে এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করাবেন, যা তার জন্য সম্ভব অথবা যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে সে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত সুখ লাভ করতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যা দিবেন, তা ছাড়া সে অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবে না এবং যা তার জন্য সম্ভব তা ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করবে না। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিই একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে সে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত পরম সুখ ভোগ করবে এবং এমন এক সুখ পাবে, যার পরে আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

অতএব এ বিষয়ে অতিরিক্ত গভীরে প্রবেশ করা এবং নারী-পুরুষের তুলনা করা এক নিন্দনীয় একগুঁয়েমি ও সময়ের অপচয়। একজন বিশ্বাসীর উচিত তার জন্য যা উপকারী, সেদিকে মনোনিবেশ করা। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন, احرص على ما ينفعك "যা তোমার জন্য উপকারী, তার জন্য আগ্রহী হও"। এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রয়োজন সেইসব কাজ ও উপায়ের দিকে মনোযোগ ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। এগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কল্পনাতীত মহা পুরস্কার দান করবেন। পুরুষদের মতোই নারীদেরও এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। অতএব আমাদের সাথে সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন এবং এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করেন, যা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি পরম দয়ালু ও দাতা।

☞ প্রশ্ন (৬) : মহিলাগণ কি পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা বা মুখ-মণ্ডল খুলতে পারবে? দয়া করে জানাবেন।

লাইক লস্কার, গোপালগঞ্জ

উত্তর : সবচেয়ে সঠিক মত, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত তা হলো, পরপুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তাই একজন যুবতী মহিলা অ-মাহরাম পুরুষদের সামনে তার মুখ-মণ্ডল প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। যাতে দুষ্ট পুরুষদের প্রলোভনের শিকার না হয়।

তবে আলেমগণ বলেছেন যে, কোনো অজুহাতে থাকলে এবং বিশেষ প্রয়োজন থাকলে মহিলাগণ মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানকারী পুরুষের সামনে মহিলা তার মুখ খুলতে পারে। সাহল বিন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها

"এক মহিলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার কাছে নিজেকে দান করে দেওয়ার জন্য এসেছি। তখন আল্লাহর রসূল তার দিকে তাকালেন এবং তার দিকে তার মাথা উঁচু করলেন এবং তাঁর মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি তা দেখল তিনি তার সম্পর্কে কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়লো। অতঃপর তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো : হে আল্লাহর রসূল, আপনার যদি তার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন।[২] এতে বুঝা গেলো, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মহিলার চেহারার দিকে তাকানো যাবে। অনুরূপ কেনাবেচা ও লেনদেনের প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে, সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজনে, বিচার-ফয়সালার সময়, শিশু বাচ্চাদের সামনে, পুরুষত্বহীনদের সামনে এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাগণ পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। অনুরূপ অতি বৃদ্ধারাও মুখ খুলতে পারবে। আর হজ্জ-উমরার ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ একাকী চলার সময় মুখ খোলা রাখা আবশ্যক। তবে পুরুষেরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলবে অথবা তারা যখন পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন মাথার ওপর থেকে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। তবে নিকাব পরে মুখ ঢাকবে না কিংবা হাতমোজা পরিধান করে হাত ঢাকবে না। আর ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে إلا ما ظهر منها এর ব্যাখ্যায় যেটা এসেছে যে, তিনি বলেছেন, মহিলাগণ মাহরাম পুরুষদের সামনে চোহারা মুখ খুলতে পারবে, তা সঠিক নয়। এর আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা বাড়ির ভিতরে মাহরাম পুরুষের সামনে হাত ও মুখ খুলতে পারবে। বাড়ির বাইরে এবং পরপুরুষের সামনে তা খোলার সুযোগ নেই। অথবা এর দ্বারা বাহ্যিক পোষাক উদ্দেশ্য। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মহিলাদের মুখ-মণ্ডলই হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল, তাই বর্তমান ফিতনার যুগে মুখ-মণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

☞ প্রশ্ন (৭) : বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার আগে দু'রাক'আত সলাত পড়ার হুকুম কী?

আজিজুর রহমান, ময়মনসিং

উত্তর : বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার পূর্বে স্বামীর পরিহিত বস্ত্রের সাথে স্ত্রীর পরিহিত পোষাক বেঁধে যে দুই রাক'আত সলাত আদায় করার প্রথা প্রচলিত আছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে প্রত্যেকেই আলাদাভাবে আল্লাহর কাছে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশের শুকরিয়া স্বরূপ দুই রাক'আত সলাত আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার আগে দু'রাক'আত সলাত পড়ার কথা কতিপয় সাহাবীর আমল দ্বারা সাব্যস্ত। তবে আমি এসম্পর্কে রাসূল (ﷺ) থেকে

[২] সহীহ বুখারী ৭/১৯, সহীহ মুসলিম ৪/১৪৩।

কোনো সহীহ্ হাদীস পাইনি। অবশ্য বাসর রাতে শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, নববধূর কপাল ধরে এই দু'আ পাঠ করবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং একে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছো তার অকল্যাণ থেকে।"[৩]

এরকম করলে স্ত্রী ভীত হবে বা অপছন্দ করবে এমন আশঙ্কা থাকলে নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা করে তার কপালে হাত রেখে তাকে না শুনিয়ে চুপে চুপে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে। কেননা কোনো কোনো মহিলা এরকম ধারণা করতে পারে যে, আমার মধ্যে কি অকল্যাণ আছে?

প্রশ্ন (৮) : তাহাজ্জুদ সলাতের সময় কখন থেকে শুরু হয় এবং কখন শেষ হয়?

জাবের, নরসিংদী

উত্তর : তাহাজ্জুদ সলাতের সময় শুরু হয় এশার সলাতের পর থেকে এবং শেষ হয় ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে। রাতের প্রথমাংশে, মধ্যরাতে এবং শেষাংশে যে কোনো সময়ে তাহাজ্জুদ পড়া যায়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাতের যে কোনো অংশে নবী ﷺ-কে সলাত পড়তে দেখতে চাইতাম, সেই সময়ই দেখতে পেতাম, তিনি সলাত পড়ছেন। আবার রাতের যে কোনো অংশে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তখনই আমরা দেখতে পেতাম, তিনি ঘুমিয়ে আছেন।[৪]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, এশার পর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত সময়ের ভিতরে তাহাজ্জুদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। অবশ্য আফযল বা উত্তম সময় হল, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ্ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমায় ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৫]নং)

প্রশ্ন (৯) : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি কি ঠিক? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কী?

উত্তর : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি ঠিক। কেননা নবী ﷺ একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

"হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে সাদকা কর। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে- এই প্রশ্ন নবী ﷺ-কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে মানুষের উপরে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর অনুগ্রহ অস্বীকার কর।"[৬] নবী ﷺ এই হাদীসে নারীদের বেশি হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশি পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে অভিশাপ করে, এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

প্রশ্ন (১০) : মহিলারা জানাযার সলাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি? দয়া করে জানাবেন

ওবাইদুর রহমান, বাগেরহাট।

উত্তর : নারীদের নিয়মিত ব্যাপকভাবে জানাযার সলাতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সালাফদের যুগে পরিচিত ছিল না। তবে পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে নারীরাও জানাযার সলাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর দলীল হচ্ছে,

أَنَّ عائِشةَ أَمَرَت أن يُمَرَّ بجنازةِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ في المَسجِدِ، فتُصَلِّيَ عليه، فأنكرَ النَّاسُ ذلك عليها، فقالت: ما

---

[৩] আবু দাউদ, অধ্যায় : কিতাবুন নিকাহ।
[৪] মিশকাত হা : ১২৪১ ।
[৫] সহীহ বুখারী হা : ৬০২১।
[৬] সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হায়য।

أسرَعَ ما نَسِيَ النَّاسُ! ما صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم على سُهَيلِ بنِ البَيضاءِ إلَّا في المَسجِدِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশ মসজিদে প্রবেশ করানোর আদেশ করলেন, যাতে তার জানাযার সলাত আদায় করতে পারেন। লোকেরা এতে তার প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, মানুষ কতই না দ্রুত ভুলে গেলো! নবী (ﷺ) সুহাইল বিন বায়যার জানাযার সলাত মসজিদেই আদায় করেছেন।[৭]

প্রশ্ন (১১) : মহিলাদের চাকরি করার হুকুম কী? দয়া করের জানাবেন।

এনামুল হক, সিলেট

উত্তর : মহিলার স্বামী তার ভরণপোষণ প্রদান করতে এবং সাধ্যমতো তার প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"ধনী ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে এবং যার জীবিকা সীমিত, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে।"[৮] বিবাহিত থাকাকালে স্ত্রী তার স্বামীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য নন, এমনকি নিজের ভরণপোষণ করতেও তিনি বাধ্য নন। তবে, যদি স্বামীর আর্থিক সহায়তা প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত হয় এবং স্ত্রীর কাছে কোনো টাকা-পয়সা না থাকে, তবে তিনি তাদের ভরণপোষণের জন্য কাজ করতে পারেন এ শর্তে যে, কাজটি ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ কোনো কিছু নয়। যেমন পুরুষদের সাথে মেলামেশা বা নিষিদ্ধ কাজে জড়িত থাকা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, একজন নারীর জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক হতে পারে যদি তা তার স্বাস্থ্য, বংশ বা নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয়। এমনকি যদি পুরুষের সাথেও হয়। তবে যথা সম্ভব হিজাব বজায় রেখে চলতে হবে এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ নির্জনতা বা পুরুষদের সাথে প্রলোভনমূলকভাবে কথা বলা পরিহার করতে হবে। তবে ধার্মিক মহিলাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হলো যদি তারা চাকরি করা ছাড়া চলতে পারেন, তবে তা না করাই ভালো। কারণ এটি তাদের জন্য অধিক সুরক্ষামূলক। তবে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা না হলে, মহিলার স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলে উপযুক্ত পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে তারা চাকরি করতে পারবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ধার্মিক মহিলাদের জন্য চাকুরী করার চেয়ে উত্তম দান করেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন (১২) : আমরা জানি যে, একজন নারীকে তার স্বামীর আনুগত্য করতে হবে এবং স্বামীর আদেশ বা নিষেধ করার কর্তৃত্ব ও অধিকার রয়েছে।

কিন্তু এটার সীমারেখা কতটুকু? এমনকি বৈধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কি সে তার স্বামীর কথা মতো চলবে? যেমন তার পছন্দের কোনো বৈধ কাজ, যেমন পড়াশোনা, পেশা গ্রহণ, বা বোন ও বন্ধুদের সাথে দেখা করা থেকেও তার স্বামী কি তাকে বিরত রাখতে পারবে? অথবা তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করতে পারবে, যা সে করতে চায় না এবং যা তার স্বামীর কোনো কাজেই আসে না? দয়া করে জানাবেন

আরাফাত, টুঙ্গীবাজার

উত্তর : প্রথমে এটা জানা উচিত যে, ভালো বিষয়ে স্বামীর প্রতি নারীর আনুগত্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে আব্দুর-রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

" إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'যদি কোনো নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, রামাযান মাসে সিয়াম রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে : 'জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে তুমি প্রবেশ করতে পারো'।"[৯]

[৭] সহীহ মুসলিম হা : ৯৭৩।
[৮] সূরা তালাক আয়াত : ৭।
[৯] মুসনাদুল ইমাম আহমাদ হা : ১৭৭১।

এই আনুগত্য সব পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক নয়, তবে বিবাহ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে, অর্থাৎ তাদের দাম্পত্য জীবনের বিষয়, যেমন অন্তরঙ্গতা এবং এ জাতীয় বিষয়ে এটি বাধ্যতামূলক।

দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, যেমন গোসল, পরিচ্ছন্নতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। একইভাবে ধর্মীয় কর্তব্য পালনের বিষয়েও তাকে স্বামীর আদেশ মানতে হবে, যেমন হিজাব পরা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, একজন নারীকে অবশ্যই নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, এমনকি যদি তার স্বামী তাকে তা করার আদেশও দেন। কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। তাহলে তো কথাই নেই, যখন স্বামী তাকে এই ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন, একজন বিবেকবান, বিশ্বাসী নারীর জন্য কি এটা শোভনীয় যে, স্বামী কোনো কর্তব্য পালন করতে বা কোনো পাপ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিলে সে অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে তার প্রভু এবং স্বামীর অবাধ্য হবে?

আলেমগণ সেই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন যেগুলোতে একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। সংক্ষেপে তাদের বক্তব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

প্রথমত বিবাহ চুক্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য।

দ্বিতীয়ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ফরজ কর্তব্য পালনে তাঁর আনুগত্য।

সুতরাং, তার ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার স্বামীর নেই। এর মধ্যে খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং ইসলামী শরীয়ত অনুসারে অনুমোদিত উপায়ে তার অর্থ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করতে পারবেন না, যা তিনি অপছন্দ করেন এবং যা বিবাহ ও এর দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত নয়। তার উপর তার অভিভাবকত্ব আধিপত্য বা স্বৈরাচারের জন্য নয়, বরং শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তার অনুমতি ছাড়া পড়াশোনা বা কাজের জন্য তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, যদি না তিনি বিবাহ চুক্তিতে বা তার আগে এই শর্তটি উল্লেখ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে, তিনি তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কাজ বা পড়াশোনার জন্য তাকে ঘর ছাড়তে না হয় এবং তা তার গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনে বাধা না দেয়, তবে তাকে তা করতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার স্বামীর নেই। শুধু ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ বা পড়াশোনার ক্ষেত্রেই স্বামীর অনুমতি লাগবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ

প্রশ্ন (১৩) : হায়েযের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কোনো সময়সীমা আছে কি? অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কতদিন তা কি নির্ধারিত আছে?

লামিয়া, কুমিল্লা

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কত দিন তা নির্দিষ্ট নেই। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يسألونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

‘আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এটি একটি অরুচিকর অবস্থা। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়”।[১০] আল্লাহ তা‘আলা এখানে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ থাকার দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি। বরং অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এটি প্রমাণ করে যে, ঋতুবতী হওয়াই সহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। যখনই ঋতু পাওয়া যাবে, তখনই সহবাস নিষিদ্ধ হবে এবং যখন তা পাওয়া যাবে না তখন সহবাস নিষিদ্ধ হবে না।

তা ছাড়া নির্দিষ্ট দিন সংখ্যা বেঁধে দেয়ার কোনো দলীলও নেই। দিন সংখ্যা নির্ধারিত থাকলে তা বর্ণনা করে দেয়ার দরকার ছিল। সুতরাং কত বছর বয়স পর্যন্ত

[১০] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২২২।

মহিলার হায়েয হয় অথবা প্রতি মাসে হায়েয শুরু হওয়ার পর কতদিন থাকে, তা যদি শরীয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হতো, তাহলে অবশ্যই তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুলাহ ﷺ-এর সুন্নাতে বর্ণিত হতো।

এর ওপর ভিত্তি করে বলতে হয় যে, মহিলাদের নিকট মাসিকের রক্ত হিসেবে পরিচিত রক্ত যখনই কোনো মহিলা নিজের জরায়ু থেকে প্রবাহিত হতে দেখবে, তখনই একে মাসিকের রক্ত হিসেব গণ্য করবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন সংখ্যা নির্ধারণ করবে না। কিন্তু কোনো মহিলার রক্তস্রাব যদি চলতেই থাকে; কখনো বন্ধ না হয় অথবা সামান্য সময়ের জন্য, যেমন মাসে একদিন বা দু'দিন বন্ধ থেকে আবার চালু হয়, তাহলে তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (১৪) : ঔষধ সেবন করে কোনো মহিলা যদি নিজে নিজেই হায়েযের রক্ত বের করে এবং সে যদি সলাত না পড়ে থাকে, তাহলে সলাতগুলো কাযা করবে কি না? দয়া করে জানাবেন।

ফাহমিদা, ঢাকা

উত্তর : নিজের ইচ্ছায় কোনো মহিলা হায়েযের রক্ত বের করলে এবং সলাত পরিত্যাগ করে থাকলে উক্ত সলাতের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা যখনই হায়েযের রক্ত দেখা যাবে, তখনই তার হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ কোনো মহিলা যদি ঋতুস্রাব বন্ধ করার জন্য ঔষধ গ্রহণ করে এবং তার ফলে ঋতুস্রাব না আসে, তাহলে সলাত ও সিয়াম যথাসময় আদায় করবে এবং সিয়ামের কাযা করবে না। কেননা সে তো ঋতুবতী নয়। অতএব যে হুকুমকে কারণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তা পাওয়া গেলেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى﴾

"আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলো, সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা"[১১] অতএব যখনই এই অপবিত্রতা পাওয়া যাবে, তার হুকুমও পাওয়া যাবে। যখন অপবিত্রতা থাকবে না, তখন কোনো হুকুমও থাকবে না।

[১১] সূরা বাকারা আয়াত : ২২২।

প্রশ্ন (১৫) : ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা কি জায়েয?

আয়শা খানম, সাতক্ষীরা

উত্তর : প্রয়োজন বশত ঋতুবতী মহিলার কুরআন পাঠ করা জায়েয। যেমন সে যদি শিক্ষিকা হয়, তাহলে শিক্ষা দেয়ার সময় তা পাঠ করা তার জন্য জায়েয। অথবা সে যদি ছাত্রী হয়, তাহলেও তার জন্য শিক্ষা লাভ করার সময় তা পাঠ করতে পারবে। অথবা মহিলা তার ছোট কিংবা বড় সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার সময় তা পাঠ করবে। তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দিবে এবং তাদের আগে কুরআন পাঠ করবে।

মোটকথা প্রয়োজন সাপেক্ষ ঋতুবতী মহিলা কুরআন পাঠ করতে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপ কুরআন পাঠ বর্জন করার কারণে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে স্মরণ রাখার জন্য হায়েয ওয়ালা মহিলাগণ তেলাওয়াত করতে পারবে। এতেও কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু কতিপয় আলেম বলেছেন, ঋতুবতী মহিলাগণ বিনা প্রয়োজনেও কুরআন পাঠ করতে পারবে।

অবশ্য আরেকদল আলেম বলেছেন, প্রয়োজন থাকলেও ঋতুবতী নারীর জন্য কুরআন পাঠ করা হারাম। সুতরাং এখানে মোট তিনটি মত পাওয়া গেলো।

কিন্তু যে কথা বলা উচিত তা হলো, ঋতুবতী মহিলা যদি শিক্ষা দান কিংবা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে কিংবা ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তাহলে সে অবস্থায় তার জন্য কুরআন পাঠ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন (১৬) : কোনো মহিলা যখন তার থেকে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারবে যে, এটি কি হায়েযের রক্ত না কি ইস্তেহাযার রক্ত না কি অন্য কিছুর, তখন সে কী করবে?

সুমাইয়া, পাবনা

উত্তর : মহিলাদের জরায়ু থেকে নির্গত রক্তের ব্যাপারে মূলনীতি হলো, তা হায়েযেরই রক্ত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হবে যে, তা ইস্তেহাযার রক্ত তখন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং নির্গত রক্তকে হায়েযের

রক্ত হিসেবেই গণ্য করবে। যতক্ষণ না তা ইস্তেহাযা বা অন্য কিছুর রক্ত হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (১৭) : সলাতের সময় হওয়ার পর হায়েয শুরু হলে তার হুকুম কী?

খাদিজা আক্তার, নোয়াখালী

উত্তর : সলাতের সময় প্রবেশ করার পর যদি নারীর মাসিক শুরু হয়, যেমন যোহরের সলাত শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হলো, তাহলে পবিত্র হওয়ার পর এই ওয়াক্তের সলাত কাযা আদায় করবে। কেননা সে পবিত্র থাকাবস্থায় তার ওপর এই সলাত আবশ্যক হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে সলাত মুমিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে"।[১২] আর ঋতু চলমান অবস্থায় যে সমস্ত সলাত পরিত্যাগ করবে, তার কাযা আদায় করবে না। কেননা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"মহিলা কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে সলাত পড়ে না ও সিয়াম রাখে না?"[১৩] আলেমদের ঐক্যমতে ঋতুবতী মহিলার হায়েয হলে তা চলমান থাকা অবস্থায় ছুটে যাওয়া কাযা আদায় করবে না।

আর ঋতুবতী মহিলা যদি কোনো সলাতের মাত্র এক রাকা'আত বা তার চেয়ে বেশি পড়া যাবে, এতটুকু সময় বাকি থাকতে পবিত্র হয়, তাহলে সে উক্ত সলাত অবশ্যই পড়বে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকা'আত সলাত পেয়ে গেলো, সে আসর সলাত পেয়ে গেলো"।[১৪]

[১২] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১০৩।
[১৩] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : হায়েয।
[১৪] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : নামাযের সময়।

সুতরাং কোনো মহিলা যদি আসরের শেষ সময় তথা মাত্র এক রাকাআত পড়া যাবে, এমন সময় পবিত্র হয় অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে মাত্র এক রাক'আত পড়া যাবে, এমন সময় পবিত্র হয় তাহলে উভয় অবস্থায় তাকে গোসল করার পর আসর বা ফজরের সলাত কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৮) : কোনো মহিলার ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এই দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে। সে এখন কী করবে?

নাফিসা আফরিন, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : কোনো মহিলার হায়েযের সাধারণ সময়সীমা যদি ছয়দিন থাকে, কিন্তু তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যদি নয়দিন, দশদিন বা এগারো দিন হয়ে যায়, তাহলে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। কেননা নবী ﷺ ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى﴾

"আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলো, এটা অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা"।[১৫]

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই রক্তস্রাব বিদ্যমান থাকবে, মহিলাও নিজ অবস্থায় থেকে যাবে। পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত-সিয়াম আদায় করবে। পরের মাসে যদি তার হায়েযের দিন পূর্বের সাধারণ সময়সীমার চেয়ে কম হয়ে যায়, তাহলে তা বন্ধ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও পূর্বের সাধারণ সময়সীমার সমান না হয়।

মোটকথা মহিলা যতদিন ঋতুবতী থাকবে ততোদিন সে সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। চাই ঋতুর দিন পূর্ববর্তী মাসের সমান হোক বা কম হোক বা বেশি হোক। পবিত্র হলেই গোসল করবে এবং সলাত পড়বে।

প্রশ্ন (১৯) : কোনো মহিলার অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সলাত শুরু করেছে। কিন্তু নয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার ঋতুস্রাব দেখা গেছে। তিনদিন ঋতুস্রাব

[১৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২২২।

প্রবহমান ছিল। এ সময় সলাত পড়েনি। তারপর পবিত্র হলে গোসল করে এগারো দিন সলাত আদায় করেছে। তারপর আবার তার স্বাভাবিক মাসিক শুরু হয়েছে। সে কি ঐ তিনদিনের সলাত কাযা আদায় করবে? নাকি তা হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে?

শেফালী আক্তার, ঢাকা

উত্তর : কোনো মহিলার যখনই হায়েযের রক্ত প্রবাহিত হবে তখনই তা ঋতু বা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। চাই সেই ঋতুর সময় পূর্বের ঋতুর সময়ের চেয়ে দীর্ঘ হোক বা কম হোক। ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পাঁচ দিন বা ছয় দিন বা দশ দিন পর পুনরায় ঋতুস্রাব দেখা দিলে সে পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে এবং সলাত পড়বে না। কেননা এটি হায়েযের মধ্যে শামিল। সবসময় এরূপই করবে। পবিত্র হওয়ার পর যখনই আবার ঋতুস্রাব দেখা দিবে তখনই তার উপর সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হবে। কিন্তু রক্ত যদি সবসময় চলমান থাকে কিংবা সামান্য সময় ব্যতীত কখনই বন্ধ না হয়, তাহলে সে মুস্তাহাযা বা অসুস্থ মহিলা বলে গণ্য হবে। তখন তার সাধারণ দিনসমূহ শুধু সলাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন (২০) : মহিলাদের উপর কি দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা জরুরী? তাদের উপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা হয়ে থাকলে তার কোন্ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত জ্ঞান অর্জনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে এবং এতে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতিই আহ্বান জানানো হয়েছে। সুনান ইবনে মাজাহ গ্রন্থে একটি নির্ভরযোগ্য সনদে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন,

طلب العلم فريضه على كل مسلم.

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" নবী ﷺ-এর সময়ে নারীরাও জ্ঞান অন্বেষণ করতেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নারীরা নবী ﷺ-কে বললেন:

غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فوعظهن وأمرهن

'আপনার কাছে পুরুষরা আমাদের চেয়ে অগ্রগণ্য হয়ে গেছে। তাই আপনার সময় থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন। তাই তিনি তাদেরকে একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের উপদেশ ও নির্দেশনা দিলেন"।[১৬]

অধিকন্তু, একজন নারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত, তা হলো তার ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা, যার মধ্যে সঠিক আকিদাহ, সুন্নাহ এবং ইবাদত পালনের যথাযথ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। মুসলিমদের উচিত তাদের নারীদেরকে ধর্মীয় জ্ঞানের বাইরের অপরিহার্য জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া। যেমন স্ত্রীরোগ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, যাতে চিকিৎসার অযুহাতে পুরুষরা নারীদের গোপনাঙ্গ দেখার সুযোগ না পায়। একজন পুরুষ কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই একজন নারীর চিকিৎসা করতে পারে। ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা-তে যেমন বলা হয়েছে: 'যদি কোনো নারীর শরীরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ঘা থাকে, তবে পুরুষের জন্য সেদিকে তাকানো জায়েয নয়। তার দিকে তাকানো উচিত নয়। এর পরিবর্তে একজন নারীকে তার চিকিৎসা করার জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি তার চিকিৎসা করার জন্য কোনো নারীকে খুঁজে না পাওয়া যায় এবং কোনো নারীকে তা শেখানোও না হয় এবং শারীরিক ক্ষতি, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তবে ঘা ছাড়া সবকিছু ঢেকে রাখা উচিত। তারপর পুরুষটি সেই নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়া যথাসম্ভব দৃষ্টি অবনত রেখে তার চিকিৎসা করবে। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রও রয়েছে যা নারীরা বেছে নিতে পারে, যেমন শিক্ষকতা, যাতে তারা অন্য নারীদের শেখাতে পারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্র যা নারীদের প্রকৃতি ও পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত। তবে এখানে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, নারীদের শেখার অনুমতি ইসলামী শরীয়ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে পুরুষদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ইসলামী পোশাক বিধি মেনে চলতে হবে; শালীন পোশাকে, কোনো অলঙ্কার বা সুগন্ধি ছাড়া বাইরে যেতে হবে। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন।❑❑

[১৬] সহীহ বুখারী হা : ১০১।

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	”	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	”	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	”	৩২/-
৫	তারাবীহ	”	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	”	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	”	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	”	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	”	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	”	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	”	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	”	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	”	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

“বিকাশ নম্বর”
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

“সাপ্তাহিক আরাফাত”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।